‘পুয়র থিয়েটার’ ও ‘পদ্মারনাচন’ : অভিনয় কৃত্যে আত্মোৎসর্গীকরণ প্রসঙ্গ

শামীম হাসান*

[সারসংক্ষেপ : গ্রটস্কির ‘পুয়র থিয়েটার’-এর মূল শক্তি হলো অভিনেতার তীক্ষ্ণ আত্মিক অনুধাবন ও তাদের অপরিসীম আঙ্গিক অভিনয় দক্ষতা। সুগভীর ভাববিহ্বলতা ও সত্তের নিমগ্নতায় গ্রটস্কির অভিনেতারা অভিনয় সৃজনপথে নিজেদের সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করে। ‘পুয়র থিয়েটারে’র আত্মনিবেদিত অভিনয় শিল্পীর এই আন্তরপ্রেরণার গভীরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের লৌকিক সংস্কৃতি, ধর্মীয় কৃত্যাচার ও রিচুয়ালিস্টিক পারফরমেন্সরীতির ধ্যানশীল সম্মোহনশক্তির প্রভাব লক্ষ করা যায়। গ্রটস্কি জানতেন যে, আদিম ধর্মাচার কৃত্যই ছিল থিয়েটারের প্রথম আঙ্গিক। তাই তিনি তাঁর নাট্যসৃষ্টিতে রিচুয়ালকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। ভক্তিভাবে সমৃদ্ধ বিভিন্ন সংস্কৃতির আবহমান কৃত্যানুষ্ঠানের বিভিন্ন উপাদানের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ ও নবতর জ্ঞান অন্বেষণে তিনি ষাটের দশকে ভারত, জাপান, হাইতি, নাইজেরিয়া, মেক্সিকো, পশ্চিম আফ্রিকা ও এশিয়ায় নানা অঞ্চল ভ্রমণ করেন। উক্ত ভ্রমণ-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তিনি শুদ্ধ ও সাত্ত্বিকতায় পূর্ণ ঐতিহ্যবাহী নৃত্য, নাট্য ও কৃত্যানুষ্ঠানে সঞ্চারিত সীমাহীন অনুধ্যানের সন্ধান পান। গ্রটস্কির থিয়েটার ল্যাবরেটরিতে বিরামহীন অনুশীলনে একাগ্র পবিত্র অভিনেতার (holy actor) আত্ম-নিরীক্ষায় প্রাচ্যদেশীয় কৃত্যের আত্মবিলোপী দর্শনের অন্তিত্ব অনুভব করা যায়। ‘পুয়র থিয়েটারে’র অভিনেতার এই পবিত্রতার বোধ ও নিষ্কলুষ আত্মিকতা প্রতিষ্ঠা প্রয়াসের সঙ্গে বাংলাদেশের কুষ্টিয়া অঞ্চলের গৃহস্থের ‘মানত’কেন্দ্রিক কৃত্যমূলক পরিবেশনা ‘পদ্মারনাচনে’র শিল্পীদের পরিবেশনাশৈলীর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। সর্পদেবী মনসার উদ্দেশ্যে নিবেদিত ‘মানতে’র পরিবেশনায় ভাবাবেশে আচ্ছন্ন কুশীলব এবং ‘পুয়র থিয়েটারে’র আত্মোন্মোচনে ধ্যানস্থ অভিনয়শিল্পী উভয়ই পারফরমেন্সের সমস্ত বাহুল্য পরিহার করে নিরাবরণ নিজেকে নির্বাধ তুলে ধরে। গ্রটস্কির থিয়েটার ল্যাবরেটরির অভিনয় শিক্ষণ প্রক্রিয়ার আত্মোৎসর্গের পথ-পরিক্রমার সঙ্গে ঐতিহ্যিক পরম্পরায় দীক্ষিত প্রান্তিক লোকশিল্পীদের স্বীয় সাধনপদ্ধতির সাদৃশ্য নিঃসন্দেহে একটি কৌতূহলোদ্দীপক অনুসন্ধান প্রসঙ্গ। গ্রটস্কির ‘পুয়র থিয়েটার’ ও বাংলার পল্লি অঞ্চলের কৃত্যমূলক ‘পদ্মারনাচনের’ পারফরমেন্সে অভিনেতাদের আত্মোৎসর্গীকরণ প্রক্রিয়া অনুসন্ধানের লক্ষ্যে এই প্রবন্ধের অবতারণা।]

ভূমিকা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বনাট্যে প্রভাব বিস্তারকারী ও প্রথাবিরোধী নাট্যকলাবিদ জর্জি গ্রটস্কি। থিয়েটারের তত্ত্ব ও প্রায়োগিক বিভিন্ন উপাদানের বিস্তৃত বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি থিয়েটার দর্শনের এক নবতর ব্যাখ্যার প্রাঙ্গণে উপস্থিত হন। প্রতীচ্য ও প্রাচ্যের বিশিষ্ট সব অভিনয় অনুশীলন পদ্ধতির পাঠ গ্রহণ ও প্রচলিত সিনথেটিক (Synthetic) বা কৃত্রিম থিয়েটার সংস্কৃতির প্রতি অনাগ্রহ গ্রটস্কির থিয়েটার ভাবনার গতিমুখ পরিবর্তন করে দেয়। থিয়েটার প্রসঙ্গে গ্রটস্কির এই নতুন চিন্তা

*সহযোগী অধ্যাপক, নাট্যকলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রচলিত থিয়েটার চর্চার গতি-প্রকৃতিতে প্রচণ্ড অভিঘাত সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। গ্রটস্কি উদ্ভাবিত থিয়েটার তত্ত্ব ও নাট্যদর্শন প্রসঙ্গে বিস্তারিত পর্যালোচনার পূর্বে তাঁর আর্বিভাবকাল এবং পোল্যান্ডের তৎকালীন আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার প্রয়াস পাব। কেননা সমকালীন ঘটনাপ্রবাহ অনুসন্ধিৎসু সৃজনশীল মনের ওপর গভীর রেখাপাত করে।

জর্জি মারিয়ান গ্রটস্কি (১৯৩৩-১৯৯৯) পোল্যান্ডের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের রজেসজো শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং ইংল্যান্ডে অবস্থানের কারণে ঐ সময় তাঁদের পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। গ্রটস্কি তাঁর মা ও ভাইকে সঙ্গে নিয়ে নাৎসি বাহিনীর আক্রমণ থেকে পালিয়ে ক্রাকাও (Krakow)-তে তাঁদের আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। যেখানে গ্রটস্কি তাঁর আঙ্কেলের কাছ থেকে 'Spiritual awakenings'[১]-এর শিক্ষা গ্রহণ করেন যা তাঁর সামগ্রিক নাট্যচিন্তায় গভীর প্রভাব ফেলে। এভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে নানা ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে নির্মিত হয়েছে গ্রটস্কির আত্মানুসন্ধানের থিয়েটার দর্শন। উল্লেখ্য যে, গ্রটস্কি ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে ক্রাকাও (Krakow) 'স্টেটস হাইয়ার স্কুল অফ থিয়েটার' থেকে অভিনয়ের ওপর গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি সম্পন্ন করে নির্দেশনা বিষয়ে অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে রাশিয়া পাড়ি জমান। ১৯৫৫-৫৬ খ্রিষ্টাব্দে মস্কোর 'Lunacharsky Institute of Theatre Art' (GITIS) অধ্যয়নকালে তিনি স্তানিস্লাভস্কি (Konstantin Stanislavski, 1863-1938) ভাকতানগভ (Yevg Vakhtangov, 1883-1922), মেয়ারহোল্ড (Vsevolod Meyerhold, 1874-1940) এবং টাইরভ- (Alexander Tairov-1885-1950)"[২]- এর মতো প্রথিতযশা নাট্যস্রষ্টাদের সৃজনশীল অভিনয় কৌশল এবং শৈল্পিক চেতনার সংস্পর্শে আসেন। পৃথিবী বিখ্যাত থিয়েটার স্রষ্টাদের সৃষ্টিশীলতায় অনুপ্রাণিত গ্রটস্কি থিয়েটার শিল্পের প্রকৃত সৌন্দর্য এবং অনবদ্যতার সন্ধানে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে নিয়োজিত করেন। থিয়েটার হয়ে ওঠে তাঁর জীবনদর্শন প্রকাশের প্রধান মাধ্যম। তারই ধারাবাহিকতায় পোল্যান্ডে ফিরে "১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে কেরাকো স্টেট থিয়েটারে ইউজিন আয়োনেস্কোর (১৯০৯-১৯৯৪) *দ্যা চেয়ার্স* নাটক পরিচালনার মাধ্যমে একজন নির্দেশক হিসেবে যাত্রা শুরু করেন"[৩]। এরপর "১৯৫৮ সালে পোল্যান্ডের ওপোলেতে প্রতিষ্ঠা করেন থিয়েটার অব থার্টিন রোজ (Theatre of 13 Rows)"[৪]। যে দলটি ধীরে ধীরে পরিণত হয় থিয়েটার ল্যাবরেটরিতে। বিজ্ঞান গবেষণাগারের আবিষ্কার স্পৃহাকে ধারণ করে থিয়েটার বিষয়ে নতুন জ্ঞান অন্বেষণ ও থিয়েটার শিল্পকে পরিপূর্ণভাবে বুঝতে সেখানে মনোনিবেশ করেন গ্রটস্কি।

পুয়র থিয়েটার (Poor Theatre) দর্শন

গ্রটস্কি থিয়েটার ল্যাবরেটরিতে বিরামহীন অনুসন্ধানে নিবিষ্ট থেকে স্বতন্ত্র শিল্পমাধ্যম হিসেবে থিয়েটারের প্রকৃত শক্তির যে সূত্র আবিষ্কার করেন, তার ব্যবহারিক নাম হতে পারে "সংযোগ সংস্থাপনার সূত্র" (রথীন, ২০০৯ : ১০)। যে সূত্রের প্রধান শর্ত হলো থিয়েটার প্রক্রিয়ায় অভিনেতা ও দর্শকের মধ্যে জীবন্ত সংযোগ ঘটবে। উল্লেখ্য যে, "অভিনেতা ও দর্শকই যে থিয়েটারের অপরিহার্য উপাদান তা থিয়েটারের জন্মলগ্ন থেকেই সত্য। পরবর্তীকালে নানাবিধ কলাকৌশল প্রয়োগের আতিশয্যে সেই সত্যটি অনেকটাই চাপা পড়ে যায়" (জিয়া, ২০০৭ : ৬২)। আর তাই গ্রটস্কি তাঁর সমকালীন প্রচলিত থিয়েটারের কৃত্রিম আড়ম্বর এবং সমস্ত বাহুল্যের প্রলোভনকে

বাতিল করে থিয়েটারের জন্য প্রস্তাব করেন দারিদ্র্যের : "I propose poverty in theatre" (জিয়া, ২০০৭ : ৬৩)। একজন শিল্পীর সৃষ্টিশীল ভাবনার পাশাপাশি এই প্রস্তাবের পেছনে হয়তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পোল্যান্ডের দারিদ্র্য ও আর্থ-সামাজিক নানা সমস্যার প্রসঙ্গ যুক্ত ছিল। এছাড়াও গ্রটস্কি উপলব্ধি করেছিলেন যে, প্রচলিত থিয়েটারে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে যে যোগাযোগ সংঘটিত হয় তাতে কোনো প্রচণ্ডতা নেই। এখানে অভিনেতা ও দর্শক আত্মিক ও অকৃত্রিমভাবে সংযুক্ত হয় না বলেই এক ধরনের সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয়। এর অন্যতম কারণ থিয়েটারকে সমন্বিত শিল্পকলা হিসেবে চিহ্নিতকরণ এবং বিভিন্ন শিল্পধারা থেকে চিত্তাকর্ষক রসদসংগ্রহ করে থিয়েটারে তা প্রয়োগের প্রবণতা। তাই প্রচলিত এই ধারাকে বাদ দিয়ে স্বতন্ত্র শিল্প আঙ্গিক হিসেবে থিয়েটারের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য ও অপরিহার্য উপাদান প্রসঙ্গে গ্রটস্কির মতামত হলো :

> কস্টিউম এবং সেট বাদ দিয়ে কি থিয়েটার হতে পারে? – হ্যাঁ পারে? কাহিনী স্ফুটনে ব্যবহৃত আবহকে বাদ দিয়ে কি থিয়েটার হতে পারে? হ্যাঁ পারে। আলোক প্রক্ষেপণ ছাড়া কি থিয়েটার হতে পারে? – অবশ্যই পারে। এবং লিখিত নাটক বাদ দিয়ে? – তাও পারে থিয়েটারের ইতিহাসে সেই নজির আছে। কিন্তু অভিনেতাকে বাদ দিয়ে থিয়েটার হয়? আমার জানা নেই।
>
> আর দর্শক বাদ দিয়ে থিয়েটার? – অন্তত একজন দর্শক আমাদের দরকার। অর্থাৎ থিয়েটারের জন্য অনিবার্যভাবে যা প্রয়োজন তা হল অভিনেতা এবং দর্শক। আমরা এখন তাহলে বলতে পারি, একজন দর্শক এবং একজন অভিনেতার মধ্যে যা ঘটে সেটাই থিয়েটার। বাকি আর সব অনুপূরক। (রথীন, ২০০৯ : ১৪-১৫)

তাই গ্রটস্কি প্রচলিত থিয়েটারকে 'Rich Theatre' বা 'Synthetic Theatre'[৫] অর্থাৎ (দোষত্রুটিতে ধনী) রূপে আখ্যায়িত করে 'পুয়র থিয়েটার' (Poor Theatre)[৬]-এর দর্শন তুলে ধরেন। যেখানে দৃশ্যপট, স্থায়ী মঞ্চব্যবস্থা, পোশাক-পরিচ্ছদ (ন্যূনতম প্রয়োজনীয় কস্টিউম ব্যতীত) মায়াবিভ্রম সৃষ্টিকারী আলো, সঙ্গীত (রেকর্ড কিংবা যন্ত্রের সাহায্যে চালিত ও সৃষ্ট মিউজিক বাতিল করেছেন) প্রভৃতি উপাদানকে থিয়েটারের জন্য বাহুল্যরূপেই গণ্য করেন। গ্রটস্কির মতে : "আমাদের প্রযোজনাগুলি হল অভিনেতা এবং দর্শকের মধ্যে গড়ে তোলা সম্পর্ক বিষয়ে এক গভীর ও বিস্তৃত তদন্ত। অর্থাৎ আমরা মনে করি, অভিনেতার ব্যক্তিগত ও দৃশ্যগত কৌশলই হল থিয়েটার শিল্পের মূল শাঁস বা প্রাণ" (রথীন, ২০০৯ : ১৯)। অভিনেতা একেবারে নিজে ও নিজেকে দৃশ্যায়িত করার যে সম্ভাবনা ও সামর্থ্যের অধিকারী সেই সক্ষমতাকেই গ্রটস্কি নাট্যকলার প্রাণ হিসেবে গ্রহণ করেন। আর সেই সক্ষমতা অর্জনে প্রয়োজন এমন এক আত্মিক প্রক্রিয়া যা কিনা গ্রটস্কির অভিনেতার আদিগন্ত পরিব্যাপ্ত অনুসন্ধান হয়ে ওঠে। তাই জেনিফার কুমিয়েগার মতে : "এই মৌলিক ভিত্তিই 'পুয়র থিয়েটার' হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে" (This basic premise became known as poor theatre) (জিয়া, ২০০৭ : ৬৫)। দারিদ্র্যের এই মেটাফোর নির্মাণের পথে গ্রটস্কি গ্রহণ করেছিলেন পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের অভিনয় রীতি-পদ্ধতি ও প্রশিক্ষণের তত্ত্ব ও প্রায়োগিকতাকে। স্তানিস্লাভস্কি থেকে শুরু করে মায়ারহোল্ড, ভাসতানগভ, ডুলিন, দেসার্ড এবং ভারতের লোকনাট্য, যোগ ও কথাকলি, জাপানের কাবুকি, নো, চীনের অপেরা এবং এশিয়া-আফ্রিকার বিভিন্ন কৃত্যমূলক লোকআঙ্গিক তাঁর নাট্যচিন্তা নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।



গ্রটস্কির নিরাভরণ থিয়েটারে বিরামহীন অনুশীলনে মগ্ন অভিনেতা

সম্পর্কের স্বরূপ অন্বেষণ : 'পদ্মারনাচন' ও 'পুয়র থিয়েটার'

অভিনেতা ও দর্শকের নিবিড় একাত্মতা ও সাক্ষাৎ-সংযোগে সৃষ্ট গ্রটস্কির এই 'পুয়র থিয়েটারে'র চূড়ান্ত ও পরম লক্ষ্য হলো আভরণহীনতা। 'পুয়র থিয়েটারের' এই নিরাভরণতা, অভিনেতাদের অভিনয়শৈলী ও থিয়েটার শিল্পের সঙ্গে যুক্ততার উদ্দেশ্য ও তাদের আত্মত্যাগের যে অর্থ, তার সঙ্গে বাংলা অঞ্চলের কৃত্যমূলক আখ্যান, ঐতিহ্যবাহী নাট্য ও ধর্মাচারকৃত্য পরিবেশনকারী শিল্পীবৃন্দের কর্মযজ্ঞের নানাবিধ সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। মধ্যযুগে বাংলা জনপদে পরিবেশনা শিল্পকলার অন্তর্গত বৈচিত্র্যপূর্ণ লোক-নাট্যাঙ্গিকের যে সন্ধান পাওয়া যায়, তার প্রায় সকল ধারায় কৃত্যাচারসমূহ অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে বিদ্যমান। সেলিম আল দীন (১৯৪৯-২০০৮) তাঁর *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য* গ্রন্থে উল্লেখ করেন :

> আমাদের জনপদে নাটক এসেছে কৃত্যের ছদ্মবেশে। শিব, ধর্ম, চণ্ডী, মনসা, গাজী, মানিকপীরের কৃত্যের অবলম্বন যখন আখ্যান তখন তার উপস্থাপনা, আসর ও দর্শক অবলম্বন

> করেই বিস্তারিত হয়। কৃত্যকে বাদ দিয়ে বাঙলা নাটকের রূপ-রীতি অন্বেষণ নিরর্থক বলেই প্রতীয়মান হবে। (সেলিম, ১৯৯৬ : ১৯)

তেমনিভাবে গ্রটস্কিও তাঁর নাট্যসৃষ্টিতে ধর্মনিরপেক্ষ পবিত্রতা, ধর্মের গাম্ভীর্য এবং বিশেষ করে কৃত্যমূলক পারফরমেন্সের প্রায়োগিক ও লৌকিক শক্তি সূত্রকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ১৯৬৮ সালে তিনি যখন 'টুওয়ার্ডস আ পুয়র থিয়েটার' (Towards A Poor Theatre) নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করছেন, সেই সময়ে প্যারিসে তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার শিরোনাম ছিল : "Today's Theatre in Search of Ritual" (জিয়া, ২০০৭ : ৭৯)। আর এই ঘোষণার মাধ্যমে তিনি শুধু থিয়েটারের নয়, কার্যত বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতির পারফরমিং আর্টের মূল কমিউনিকেশান টেকনিক বা সংযোগসূত্রের ওপর দীর্ঘমেয়াদি অনুসন্ধানের কাজ শুরু করেন। এই সময়কালে ধর্মাচার কৃত্যমূলক পারফরমেন্সের রীতি, প্রথা ও কৌশল সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞান আহরণের জন্য তিনি বিশ্বের নানা দেশ ভ্রমণ করেন। সেসব দেশের নিজস্ব লোকনাট্যের বিভিন্ন আঙ্গিকের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার প্রয়াস চালান এবং কৃত্যমূলক লোক-আঙ্গিকের পারফরমারদের দক্ষতার সূত্রগুলি অনুধাবন করার চেষ্টা করেন। পাশাপাশি তিনি লোকশিল্পের শক্তি ও সৌন্দর্য দ্বারা সমৃদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হন। দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তিনি বুঝতে চেষ্টা করেন যে, জীবিকা নির্বাহের জন্য নানা ধরনের ক্ষুদ্র পেশায় জড়িত লোকশিল্পীরা পারফরমেন্সের সময় কীভাবে তাদের ঐ প্রাত্যহিক ভারসাম্য (Daily Balance)-কে উৎকর্ষময় ভারসাম্যে (Luxury Balance)-এ রূপান্তরিত করে। এ প্রসঙ্গে আলোচ্যমান প্রবন্ধের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 'পদ্মারনাচনের' মূল গায়েন মোহাম্মদ শেরেবুল ইসলামের নিত্য-নৈমিত্তিক বাস্তবতা থেকে পারফরমেন্সে প্রদর্শিত শিল্পসত্য সৃষ্টির পথ উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করা যেতে পারে। তবে 'পদ্মারনাচন' ও 'পুয়র থিয়েটারে' দর্শকের সঙ্গে পারফরমারদের যোগাযোগ কৌশলের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন, দুটি শিল্পাঙ্গিকের মৌলিক ও প্রধান প্রধান বিষয়সমূহের আলোচনার পর উপরিউক্ত তাৎপর্যপূর্ণ প্রসঙ্গটি বিশ্লেষণের প্রয়াস পাব।

সার্বিকভাবে 'পদ্মারনাচনে'র বৈশিষ্ট্য ও পরিবেশনার রীতি-পদ্ধতির প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ অভিজ্ঞতার আলোকে অনুমান করা যায় যে, গ্রটস্কি দর্শক-অভিনেতার মধ্যে কার্যকর ও সর্বাত্মক যোগাযোগ সৃষ্টির জন্য সারা বিশ্বের ট্রেডিশনাল ও কৃত্যমূলক পরিবেশনা আঙ্গিকসমূহে যে সূত্রের অনুসন্ধান করেছিলেন, বাংলার মধ্যযুগের কৃত্যমূলক ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনা শিল্পকলা যেন সেই সহজ ও অকৃত্রিম সংযোগের আদর্শ আঙ্গিক। যেখানে দর্শক-অভিনেতা সমস্তরে অবস্থান করে সহৃদয়তার সাথে পারফরমেন্সের রস আস্বাদন করে। বাংলার প্রান্তিক মানুষের যাপিত-জীবন প্রবাহে উৎপাদন, প্রজনন-প্রতিপালন, রোগ-ভোগ থেকে মুক্তি, বিচিত্র আনন্দ আয়োজন কিংবা ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে কৃত্যাচারের এক নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। মধ্যযুগে সমগ্র বাংলা অঞ্চলে আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রতিনিধিত্বকারী ও আপামর জনমানুষের মধ্যে ভাববিনিময়ে সক্ষম সর্বাধিক উপযুক্ত মাধ্যম হিসেবে কৃত্যরীতির পারফরমেন্স ধারায় 'মঙ্গলকাব্য' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মধ্যযুগের বাংলায় মঙ্গলকাব্যের অপ্রতিহত প্রভাব ও গুরুত্ব বিবেচনা করে সৈয়দ জামিল আহমেদ (১৯৫৫) তাঁর *হাজার বছর : বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা* গবেষণা গ্রন্থে উল্লেখ করেন : "মঙ্গলকাব্য ভিত্তিক 'কথানাট্য'কে আখ্যায়িত করা যেতে পারে মধ্যযুগে বাংলার জাতীয় নাট্যকলা হিসেবে" (জামিল, ১৯৯৫ : ১২)। নাট্যাচার্য সেলিম আল দীন 'মঙ্গলকাব্য'কে মধ্যযুগের

'বিশ্বকোষ' (সেলিম, ১৯৯৬ : ১৮৯) হিসেবে অভিহিত করেছেন। মধ্যযুগে সমগ্র বাংলা জনপদে লৌকিক ও পুরাণ আশ্রিত নানা দেবদেবীকে কেন্দ্র করে রচিত মঙ্গলকাব্যের সংখ্যা বিস্ময়কর। তার মধ্যে অনার্য সর্পদেবী মনসার প্রতি সম্মান ও প্রশংসার নিমিত্তে নিবেদিত 'মনসামঙ্গল' অন্যতম। 'পদ্মাপুরাণ' বা 'মনসামঙ্গলের' উল্লেখযোগ্য কবি বিজয়গুপ্ত। প্রায় ছয়শত বছর ধরে বাংলার বিভিন্ন পল্লি অঞ্চলের লোক শিল্পীরা বিভিন্ন রীতিতে এই 'পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গলের' কাহিনি পরিবেশন করে আসছে। যেমন : বাংলাদেশের কুষ্টিয়া অঞ্চলে সর্পদেবী মনসার উদ্দেশ্যে মানত উপলক্ষ্যে বহুল পরিবেশিত কৃত্যমূলক পারফরমেন্স 'মনসামঙ্গল' বা 'পদ্মাপুরাণ'। স্থানীয়ভাবে যাকে বলা হয় 'পদ্মারগান' অথবা 'পদ্মারনাচন'। তবে এ অঞ্চলের জনসম্প্রদায়ের কাছে 'মনসামঙ্গল' 'পদ্মারনাচন' নামেই অধিক পরিচিত।

এ পর্যায়ে 'পদ্মারনাচনে'র আঙ্গিক, বিষয়বস্তু পরিবেশনা পদ্ধতি উপস্থাপনের মাধ্যমে এই শিল্পাঙ্গিকের সঙ্গে জর্জি গ্রটস্কি প্রবর্তিত 'পুয়র থিয়েটার' দর্শনের তুলনামূলক পর্যালোচনা তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে। 'মঙ্গলকাব্যে'র পরিবেশনা বিশেষ দিন, তিথি বা মাস নির্ভর হলেও কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা, মিরপুর ও দৌলতপুর থানার বিভিন্ন গ্রামে মানত, পূজা ও পার্বণ উপলক্ষ্যে প্রায় সারা বছর জুড়েই 'পদ্মারনাচনে'র পরিবেশনা লক্ষ করা যায়। তবে তুলনামূলকভাবে ভাদ্র মাসে সবচেয়ে বেশি 'পদ্মারগানে'র আসর চোখে পড়ে। এ অঞ্চলের 'পদ্মারগান' বা 'পদ্মারনাচন' পরিবেশনকারী দলগুলো সর্বোচ্চ ০৭ (সাত) দিন ০৭ (সাত) রাত অথবা ন্যূনতম ০২ (দুই) দিন ০২ (দুই) রাতব্যাপী পালা পরিবেশন করে থাকে। গায়েন, বায়েন, দোহার ও ছুকরি নৃত্যশিল্পী মিলে সাধারণত ১০ (দশ) জনের একটি দল এই পালা পরিবেশন করে। তবে মানতকারী বা আয়োজকদের সামর্থ্য অনুযায়ী দলের ছুকরি নৃত্য শিল্পীদের সংখ্যা কম বা বেশি করার রেওয়াজ রয়েছে। 'শোলক নসিমন' দলের সাংগঠনিক প্রধান মো: শোলক বলেন : "যদি কেউ এই গান একবার মানত করে কিন্তু আর্থিক কারণে তিনি অনুষ্ঠান আয়োজনে অক্ষম হন তখন তারা স্বপ্রণোদিত হয়েই মানতকারীর আশা পূরণে পালা পরিবেশন করে থাকেন"[৭]। তবে তাৎক্ষণিকভাবে হয়তো উপস্থিত দর্শকবৃন্দের কাছ থেকে 'ফেরি' (পারফরমেন্সকালীন সমবেত দর্শকদের কাছ থেকে আর্থিক সহযোগিতাকে স্থানীয়ভাবে 'ফেরি' বলা হয়ে থাকে) তোলেন। এই আর্থিক সাহায্য দাম কিংবা দান নয় বরং সমবেত দর্শকমণ্ডলীর স্বেচ্ছায় এই অর্থ প্রদানকে বলা যেতে পারে এক ধরনের অংশগ্রহণ। 'পদ্মারনাচনে'র এই 'ফেরি' তোলার সঙ্গে শহুরে নাগরিক থিয়েটারের দর্শনীর বিনিময়ে নাটক দেখা প্রথার নিশ্চয়ই অনেক পার্থক্য রয়েছে। কেননা নাগরিক থিয়েটারে বক্সঅফিস সাফল্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু 'পুয়র থিয়েটারে'র প্রবক্তা গ্রটস্কির থিয়েটার দর্শন বিশ্লেষণ করলে উপলব্ধি করা যায় যে, প্রচলিত থিয়েটারের বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য ও বিনোদন সর্বস্ব প্রবণতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, থিয়েটারকে তিনি একটি সুস্পষ্ট অঙ্গীকার ও অধ্যবসায়ক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। অভিনয় শিল্প তাঁর কাছে বিশেষভাবে 'থ্যাঙ্কলেস আর্ট'। তাই তিনি তাঁর অভিনেতাদের কাছে দ্রুত ফল আশা করেন না এবং অভিনেতারাও তার পারফরমেন্সের বিনিময়ে দর্শকদের কাছে কিছু প্রত্যাশা করেন না কিংবা প্রশংসায় ভেসে যেতে চান না। গ্রটস্কির থিয়েটার বুর্জোয়া ও ভোগবাদী জীবনযাত্রার বিরোধিতা করে। গ্রটস্কির শিল্পচর্চার মূল দর্শন হলো বিরুদ্ধতার মধ্য দিয়ে সত্যের অনুসন্ধান। কেননা তিনি মনে করেন, "বিরোধিতা করাটাই জীবনের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত" (রথীন, ২০০৯ : ৫৩)।

জীবন ও জগৎ সম্পর্কে গভীর অনুধ্যান ও নিরলস অনুসন্ধানের মাধ্যমে তিনি উপলব্ধি করেন যে, "থিয়েটার হল মানুষের জীবনের চূড়ান্ত বাস্তব প্রতিচ্ছায়া তাকে তাই চূড়ান্তভাবেই এবং চূড়ান্ত নিজস্বরূপেই দেখা উচিত" (রথীন, ২০০৯ : ১০)। তাই তিনি কঠোর নিয়মবদ্ধতা ও নিষ্করুণ স্থিরচিত্তে থিয়েটারকে পরম প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করে, এক সুকঠিন শিল্পের সুন্দর ভুবনে যাত্রা করেন। যেখানে শিল্পের প্রয়োজনটা সুনাম কিংবা মুনাফা অর্জনের পথ না হয়ে প্রকৃত অর্থেই আত্মিক হয়ে উঠবে এবং যে প্রক্রিয়ায় দর্শক-অভিনেতা অবিরাম আত্ম-উন্মোচনের পথ খুঁজে যাবে। অজস্র ভ্রান্তি ও ত্রুটিতে সমৃদ্ধ সমকালীন রিচ থিয়েটারের সমস্ত রকম বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য ও যান্ত্রিক প্রকৌশলের অপসারণ এবং জৈব শিল্পকর্ম ধারণাকে বাতিল করে দিয়ে, থিয়েটার একক ও সার্বভৌম শিল্পকলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।

গ্রটস্কির উক্ত শিল্পভাবনার পরিপূরক ভক্তিভাব ও মানবীয় গুণসমৃদ্ধ মানতকেন্দ্রিক 'পদ্মারনাচনে'র পরিবেশনায় নির্দিষ্ট দিনে কোন কোন পালা অভিনীত হবে, সাধারণত তা মানতকারীর অনুরোধ ও অনুষ্ঠানের সময়ের উপর নির্ভর করে। 'শোলক-নসিমন' দলের মূল গায়েন শেরেবুল ইসলাম বলেন : ০২(দুই) দিন ০২(দুই) রাতব্যাপী পরিবেশিত পালায় সাধারণত লখিন্দরের জন্মখণ্ড থেকে পারফরমেন্স শুরু করা হয়। অনুষ্ঠানের দৈর্ঘ্য বড় হলে আখ্যানভাগও দীর্ঘ হয়। এক্ষেত্রে তারা লখিন্দরের জন্মখণ্ড থেকে শুরু না করে মনসার জন্মখণ্ড থেকে পালা শুরু করেন। বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যের সহজ ও নমনীয় বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীর অনুরোধেও কখনও কখনও গায়েন বিভিন্ন পালার পরিবেশন করেন। সকাল ০৯.০০ (নয়)টা থেকে শুরু করে দিনের বিভিন্ন ভাগে নির্দিষ্ট সময় বিরতি নিয়ে রাত প্রায় ০২.০০ (দুই)টা পর্যন্ত এই আসর চলতে থাকে। মোহাম্মদ শেরেবুল ইসলাম ও তার দল পরিবেশিত 'পদ্মারনাচনে'র আখ্যানভাগ সাধারণত লখিন্দরের জন্ম, বিবাহ, সর্পদংশন, ভাসান, লখিন্দরের জীয়ন, বেহুলা ও লখিন্দরের মর্তে ফিরে আসা, শেষ পর্যন্ত দেবী মনসাকে বামহস্তে চাঁদ সওদাগরের পূজা প্রদান এবং পুনরায় বেহুলা ও লখিন্দরের বাসর ঘরে প্রবেশের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। যদিও উক্ত প্রত্যেকটি আখ্যান ভাগের মধ্যে অনেক উপকাহিনি রয়েছে।

আত্মোন্মোচন, আত্মানুসন্ধান ও আত্মোৎসর্গীকরণ : অভিনয় ও অনুশীলন পদ্ধতি

মো: শেরেবুল ইসলাম কুষ্টিয়া তথা বাংলাদেশে 'পদ্মাপুরাণ' পরিবেশনকারী লোকশিল্পীদের মধ্যে অন্যতম। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি মেহনতি মানুষ মো: শেরেবুল 'পদ্মারনাচন' পরিবেশনকারী উক্ত 'শোলক-নসিমন' দলের প্রধান গায়েন বা বলা যায় মূলশিল্পী। 'সাধনা' (উপমহাদেশীয় সংস্কৃতি প্রসার কেন্দ্র) ঢাকা 'পদ্মারনাচন' পরিবেশনা শৈলীর ওপর গবেষণাধর্মী এক দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে। সার্বিক পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে নাগরিক নৃত্য ও নাট্যশিল্পীদের প্রশিক্ষণ দান এবং প্রশিক্ষণ শেষে একটি নৃত্যনাট্য নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়াও এই উদ্যোগের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 'পদ্মারনাচনের' কৃত্য, নৃত্য, গীত, বাদ্য ও অভিনয় উপাদানের সঙ্গে নাগরিক শিল্পীদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটানো। পাশাপাশি সমকালীন পারফরমিং আর্টস (Performing Arts) চর্চায় 'পদ্মারনাচনের' শৈল্পিক উপাদানের প্রয়োগ সম্ভব্যতা যাচাই করা। 'সাধনা' আয়োজিত উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ও নির্মিতব্য নৃত্যনাট্যের একজন নাট্যনির্দেশক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে বর্তমান প্রবন্ধকারের শেরেবুল ইসলাম ও তার দলের

কর্মপদ্ধতির সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে পরিচিত হবার সুযোগ ঘটে। শেরেবুল ও তার দলের সঙ্গে দীর্ঘ সময়ের শৈল্পিক সম্বন্ধের প্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায় যে, একজন শিল্পী হিসেবে পারফরমেন্সের প্রতি শেরেবুল ইসলামের শ্রদ্ধা-ভক্তি, শুদ্ধতার বোধ এবং পরিবেশনায় উৎকর্ষময় দক্ষতার প্রকাশ নিঃসন্দেহে সমীহ জাগানিয়া। এছাড়া তাঁর পরিবেশনার মহৎ উদ্দেশ্য, প্রচলিত ঘরানার বিনোদন সর্বস্ব অনেক লোক পরিবেশনা থেকে তাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আপাদমস্তক একজন নির্মোহ শিল্পী ও সহজ ব্যক্তিমানুষ মোহাম্মদ শেরেবুল ইসলাম। যিনি 'মানতকারী'র সুস্থতা ও মঙ্গল কামনার্থে নিঃস্বার্থ নিজেকে পারফরমেন্সের মাধ্যমে উজাড় করে দেন। নিজস্ব শিল্প পারঙ্গমতাকে যে কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে প্রয়োগের প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই শিল্প সততার চূড়ান্ত উদাহরণ। যার সঙ্গে গ্রটস্কির 'মোনাসটিক' (Monastic) (রথীন, ২০০৯ : ৫৭) থিয়েটারের অভিনেতার পবিত্রতাবোধ ও আত্মোৎসর্গীকরণের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি প্রচেষ্টার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। পারফরমেন্সের মুখোমুখি হয়ে আত্ম-বিকাশ ও আত্মানুসন্ধানে নিমগ্ন জীবন্ত অভিনেতা ও জীবন্ত দর্শকের কাছে 'পুয়র থিয়েটার' প্রক্রিয়া নিঃসন্দেহে এক সাধন প্রণালি। যেখানে দর্শক অভিনেতা কেউই নিজেদের সম্পর্কে সত্য থেকে পালিয়ে যায় না। এই শিল্পসাধন প্রক্রিয়ায় সে প্রতিমুহূর্তে নিজেকে অনাবৃত করে। মুখোশের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা অন্তর্নিহিত ব্যক্তিত্বের স্তরকে আবিষ্কার করে। এ যেন শিল্পের অন্য ধারা অন্য নিশানা, যেখানে অভিনেতা অস্তিত্বের গভীর উপলব্ধি এবং দর্শক সত্তার সান্নিধ্য প্রাপ্তির প্রয়াসে এক নির্মোহ আত্মত্যাগের তরিকা গ্রহণ করে। "এ কোন প্রথাগত বাণিজ্যিক থিয়েটার নয় যে, প্রত্যেক অভিনেতা চাইবেন যে তার নামে হাততালি পড়ুক। তার নাম চিৎকৃতস্বরে উচ্চারিত হোক, ফুল বা অন্য প্রতীকী সংবর্ধনায় তিনি ভরে উঠুক" (রথীন, ২০০৯ : ৫৩)। এ হলো নিজেকে পরিশুদ্ধকরণের এক দীর্ঘপথ যেখানে অভিনয় শিল্পটা হচ্ছে সন্ন্যাসীর জীবনের মতো উৎসর্গীকরণ (শাহীন, ২০০৪ : ৪র্থ সংখ্যা, থিয়েটারওয়ালা)। আর 'পুয়র থিয়েটারে' এই উৎসর্গ প্রবাহে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদন করে গ্রটস্কির অভিনেতারা। কারণ, অভিনেতার নিজস্ব সামর্থ্যের দ্বারা সক্রিয় অভিনয় নির্মাণ দক্ষতাই 'পুয়র থিয়েটারে'র মূলবিষয়। আর তাই অধ্যবসায়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ গ্রটস্কির অভিনেতারা তাদের দেহ ও কণ্ঠস্বরের সাহায্যে দর্শকদের জন্য দৃশ্যগত চিত্রকল্প তৈরি করে। সে কারণে অভিনেতাই হচ্ছে গ্রটস্কির "কোর অফ থিয়েটার আর্ট (Core of Theatre Art)" (জিয়া, ২০০৭ : ৬৫)। একইভাবে 'মানত' ব্রত পালনের অনুষ্ঠান 'পদ্মারনাচন'-এর পরিবেশনায় পারফরমাররা 'মানতে'র সমগ্র কৃত্যাদি পালন ও লোক পুরাণের অনন্ত-সরোবরে অবগাহন করে পরোপকারে যেন নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করে। অর্থাৎ যে মানত করেছে তার মনোবাসনা যাতে পূর্ণ হয় সেজন্য অভিনেতারা তাদের সামর্থ্যের সবটুকু উজাড় করে দিয়ে অভিনয় কৃত্যে শামিল হয়। ভান, মিথ্যা, কৃত্রিমতা এবং নিজ সত্তাকে প্রকাশের পথে সমস্তরকম জড়তার প্রতিবন্ধকতাকে পরাস্ত করে তারা যেন মানসিক ও শারীরিক শক্তির শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছায়। যে স্তরের অভিনয়কৃত্যে কোনো বাধ্যতা নেই, নেই কোনো প্রলোভন। সবটাই যেন শিল্পীর অবচেতন সৃজনসত্তার স্বতঃস্ফূর্ত ও ভালোবাসাময় ভাবাবেগের প্রকাশ। "বিশেষ করে পরিবেশনার প্রধান কুশীলব শেরেবুল ইসলাম ভক্তিভাবে স্নাত হয়ে যখন অভিনেয় চরিত্রে আবির্ভূত হন, তখন সত্যিই যেন তার ওপর অতিলৌকিক উজ্জীবনী শক্তি ভর করে"[৮]। এ যেন গ্রটস্কির অভিনেতার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে আত্মোন্মোচন প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে মানুষের আত্মিক প্রকৃতিকে উন্মুক্ত বা প্রকাশ্য করে দেওয়ার সাধনা। যেখানে অভিনেতা প্রাত্যহিক

মুখোশকে ছিড়ে একজন সাধকের ধ্যানশীলতাকে মূলমন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করে। 'পদ্মারনাচনে'র শিল্পীদের অনুরূপ গ্রটস্কির অভিনেতারাও অভিনয়ে নিজেদের সম্পূর্ণরূপে (totally) সমর্পণ করে। মানবদেহের অনাবিষ্কৃত অসীম সম্ভাবনার উৎস সন্ধানে নিরত অভিনেতাদের গ্রটস্কি 'total actor' হওয়ার আহ্বান করেন। আর এই সূত্র ও পথ ধরেই গ্রটস্কির অভিনেতারা হয়ে ওঠে 'হলি অ্যাক্টর' (holy actor)। যে শৈল্পিক অনুশীলন পথে 'পুয়র থিয়েটারে'র পবিত্র অভিনেতা তার অন্তরাত্মাকে উৎসর্গে উৎসাহী হয়ে ওঠে এবং অন্তর্জগতের গভীরে প্রবেশ করে তাকে এমন স্তরে নিয়ে যায়, যেখানে অভিনয়শিল্পী একজন পূর্ণসত্তার মানুষ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এই স্তরে উত্তীর্ণ অভিনেতা তখন আর নিজের শরীরকে দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য প্রদর্শন করেন না কিংবা বিক্রি করেন না, বরং উৎসর্গ করেন। তখনই সম্ভব হয়ে ওঠে দর্শকের সঙ্গে অভিনেতার সুসংবদ্ধ মিথস্ক্রিয়া। একইভাবে 'পদ্মারনাচনে'র অভিনয় শিল্পীরা তাদের ওপর মানতকারীর আস্থা ও বিশ্বাসকে বুকে ধারণ করে সামর্থ্যের সবটুকু নিংড়ে দিয়ে পারফরমেন্স প্রক্রিয়ায় একাত্ম হন। মানতকারী যে বিশ্বাসে 'পদ্মারগান' মানত করেছে সেই বিশ্বাসের সম্মান রাখা তাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মূল গায়েন শেরেবুল ইসলামসহ অন্যান্য প্রায় সকল কুশীলবদের পারফরমেন্সের প্রতি এই একাগ্রতার উদ্দেশ্য সম্পর্কে মোহাম্মদ শেরেবুল ইসলাম বলেন : "গান যদি ভালো হয় তাহলে মানতকারীর আশা পূরণ হবে, রোগ সেরে যাবে। আর আমরা যদি সম্পূর্ণরূপে নিজেকে সঁপে দিয়ে অভিনয়ে যুক্ত হই, তাহলে দেবী (সর্পদেবী মনসা) খুশী হবেন, আর তখনই রোগবালাই থেকে পূজারীর মুক্তি ঘটবে"[৯]। এই বিশ্বাসই 'পদ্মারনাচন' শিল্পীদের পরমানন্দিত শরীরে সম্মোহনী শক্তি সঞ্চার করে। আর তখন তারা ঘোর লাগা ভাবাবেশে শৈল্পিক দক্ষতায় গেঁথে চলে লৌকিক আখ্যানের সুনিপুণ চিত্রমালা। 'পদ্মারনাচনের' স্বেচ্ছাপ্রণোদিত লোকশিল্পীদের পবিত্রতাবোধ ও আত্মোৎসর্গীকরণের এই প্রক্রিয়াই যেন গ্রটস্কির 'পুয়র থিয়েটারের' সারবস্তু।



'পদ্মারনাচন' অবলম্বনে 'সাধনা' ঢাকা প্রযোজিত 'পদ্মা-বেহুলা আখ্যান'
নৃত্যনাট্যে দেবী মনসা চরিত্রে মোহাম্মদ শেরেবুল ইসলাম।

আধ্যাত্মিকতা, ধর্মাচারকৃত্য ও ধর্মনিরপেক্ষ নাট্যাঙ্গিক

বিশ্বভূগোলের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক চেতনার নির্যাসকে ধারণ করেই গ্রটস্কির থিয়েটার চেতনায় উক্ত আত্মোন্মোচন-আত্মত্যাগ কিংবা আত্মোৎসর্গের প্রসঙ্গগুলো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। কেননা তিনি মিলিত হয়েছিলেন অজস্র সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির সঙ্গে। উপমহাদেশীয় বিভিন্ন ধর্মাচারকৃত্যের ঐতিহ্য এমনকি মহাত্মা গান্ধীর মানবতাবাদী দর্শন ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার শিক্ষা দ্বারা অনুপ্রাণিত গ্রটস্কি বলেন :

> যদি অভিনেতা নিজেকে প্রকাশ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামান তাহলে তিনি পবিত্রতা লঙ্ঘন করেন, এবং তার ধর্মের বিরোধিতা করেন। অভিনেতা যদি সত্যিই সৎ হন, এবং সত্যনিষ্ঠ থেকে যদি নিজের অন্তরাত্মাকে নির্মমভাবে উৎসর্গ করেন, তখনই সম্ভব হয়ে ওঠে দর্শক ও শিল্পীর প্রকৃত যোগাযোগ। (রথীন, ২০০৯ : ৪১)

নিরহঙ্কার ও নিরাভরণ মহাত্মা গান্ধীর মানবতাবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ গ্রটস্কি তাঁর অভিনেতাদেরকে আত্ম-অনুধ্যানের সেই শিক্ষাই প্রদান করেন যেখানে ব্যক্তির ভিতরের সমস্ত সত্য-মিথ্যা নিয়ে গঠিত যে জীবনসত্য, সেই সত্যের উন্মোচন করবে ব্যক্তি হিসেবে অভিনেতা। মহাত্মা গান্ধীর জীবনদর্শনে অনুপ্রাণিত গ্রটস্কি ১৯৭০ সালে এক সাক্ষাৎকারে বলেন : "I wanted to be a political guru [...] I was so fascinated by Gandhi that I wanted to be like him" (জিয়া, ২০০৭ : ৭৮)। এ প্রসঙ্গে মানবমঙ্গলের সূত্রসন্ধানে দেহতত্ত্বের সাধনায় নিমগ্ন বাংলার আরেক আধ্যাত্মিক বাউল সাধক লালন সাঁই প্রণিধানযোগ্য। যিনি সত্যকে জানা ও পাওয়ার মাঝখানে একমাত্র দেহকেই অবলম্বন করেছেন। আত্মার আবাস যে দেহে সেই দেহের ভিতরেই তিনি দেহাতীতের সন্ধান করেছেন। এ যেন গ্রটস্কির পবিত্র অভিনেতার দেহের অস্তিত্ব থেকে অনস্তিত্বের গন্তব্যে পৌঁছানোর পথ। "এছাড়াও গ্রটস্কি তাঁর অবজেকটিভ ড্রামার কার্যক্রমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ঐতিহ্যিক ধর্মাচার কৃত্য ও নাট্যকৃত্যের আঙ্গিকে দক্ষ ও কুশলী শিল্পীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সেখানে অন্যান্য অনেক দেশের সাথে তুরস্ক থেকে সুফি মতবাদে বিশ্বাসী নৃত্য শিল্পীদল এমনকি মধ্যপ্রাচ্য থেকে দরবেশ দল অংশগ্রহণ করেছিল" (জিয়া, ২০০৭ : ৯০)। তাই সুফিবাদের আধ্যাত্মিক কবি রুমির জাত, কাল, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, পাত্র নির্বিশেষে সমস্ত কিছুর প্রতিবন্ধকতাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে আশেককে তার মাশুকের সঙ্গে পরম মিলনের দিকে চুম্বকের ন্যায় টেনে নিয়ে যাওয়ার যে প্রেম তরিকা, তার সঙ্গে গ্রটস্কির পরিচয় ঘটা অসম্ভব নয়। কেননা গ্রটস্কিও হলি অ্যাক্টরদের (holy actor) প্রশিক্ষণ পদ্ধতির সঙ্গে সুফিবাদের পরমাত্মার নৈকট্য লাভের সাধন প্রণালির সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। আত্মোন্মচনে নিমগ্ন গ্রটস্কির হলি অ্যাক্টর (holy actor)-রা নিজের সমস্ত নিজস্বতাকে নগ্ন করে দিয়ে, উন্মুক্ত করে দিয়ে একটি চরমস্তরে পৌঁছাতে চেষ্টা করে। যেখানে তার শারীরিক সমস্ত প্রতিবন্ধকতা বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাই পিটার ব্রুক (১৯২৫) মনে করেন : গ্রোটোওস্কির থিয়েটার "Is holy because its purpose is holy" (জিয়া, ২০০৭ : ৬৬)।

গ্রটস্কির থিয়েটারের এই যে পবিত্র উদ্দেশ্য, পবিত্র অভিনেতা কিংবা আত্মোৎসর্গীকরণ প্রকৃতি হয়তোবা মানুষের মধ্যে ধর্মীয় চিন্তা কিংবা আধ্যাত্মিকতা বোধ জাগ্রত করতে পারে। সার্বিকভাবে গ্রটস্কির শেকড় সন্ধানী থিয়েটার যাত্রার সঙ্গী হলে তাতে হয়তো আধ্যাত্মিকতার স্পর্শ পাওয়া

অসম্ভব নয়। তবে আধ্যাত্মিকতাবাদ বা মরমিবাদ সম্পর্কে বলা হয় যে, এ হচ্ছে সেই ধ্যান যার দ্বারা সমগ্র বিশ্বসত্তার সঙ্গে সৃষ্টির সম্মিলন ঘটে। সে সাক্ষাৎ ঈশ্বরকেন্দ্রিক হতে পারে আবার ঈশ্বর বহির্ভূত হতে পারে। আধ্যাত্মিকতা মানে হচ্ছে ধ্যান। একমাত্র ধ্যানের মাধ্যমেই মন সম্পর্কে সচেতন হওয়া যায়। আর ধ্যানশীলতাই আসলে গ্রটস্কির থিয়েটারের আধ্যাত্মিকতা। গ্রটস্কি তাঁর থিয়েটারে যে পবিত্রতার প্রস্তাব করেন নিশ্চিতভাবেই তা ধর্মনিরপেক্ষ পবিত্রতা কারণ গ্রটস্কি বিশ্বাসী নন। 'পুয়র থিয়েটারে' 'holiness' প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি : "I speak about 'holiness' as unbeliever, I mean a secular holiness" (Grotowski, 2002 : 34).

তিনি বলেন : "আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি একজন অবিশ্বাসীর মতো পবিত্রতা বিষয়ে বলছি। আমি বলতে চাইছি 'ধর্মনিরপেক্ষ পবিত্রতা'র কথা" (রথীন, ২০০৯ : ৪১)। একইভাবে 'পদ্মারনাচন' পরিবেশনারীতিতে পূজা, কৃত্য পালন এবং আখ্যান পরম্পরায় ধর্মীয় অনুষঙ্গের উপস্থিতি কিংবা ধর্মাভাবের আবহ সৃষ্টি হলেও নিঃসন্দেহে সেই বোধ ধর্মনিরপেক্ষ। যার দ্বারা সুনির্দিষ্ট কোন ধর্মকে উৎসাহিত কিংবা চিহ্নিত করা যায় না। কেননা হিন্দু জীবনাচার সমৃদ্ধ মধ্যযুগের লৌকিক পুরাণ কাহিনি *মনসামঙ্গল* বা *পদ্মাপুরাণে*র মূল গায়েন মো: শেরেবুল ইসলাম একজন মুসলিম যুবক এবং তার দলের প্রায় প্রত্যেক সদস্য ইসলাম ধর্মাবলম্বী। এখানেই 'পদ্মারনাচন' পরিবেশনা রীতির ধর্মনিরপেক্ষ বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। তাছাড়া হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই এই গানের মানত করে। তাদের ভাষ্যমতে, এই পরিবেশনায় মুসলিম দর্শকদের উপস্থিতি বেশি। এভাবে 'পদ্মারনাচন'সহ আবহমান বাংলার নানা কৃত্যানুষ্ঠানে ধর্মীয় আচার ও পবিত্রতার বোধ থাকলেও প্রকৃতপক্ষে এসব কৃত্যাদির আন্তরসত্তায় ধর্মনিরপেক্ষতা বিদ্যমান। তাই হিন্দু ধর্মীয় আচার সর্বস্ব 'পদ্মারনাচন' শেরেবুলের মত এক মুসলিম যুবক ৩০ বছর ধরে পরিবেশন করলেও তাকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কখনও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়নি। পাশাপাশি একজন অবিশ্বাসী হিসেবে গ্রটস্কি যখন তাঁর 'পুয়র থিয়েটারে' পবিত্র অভিনেতার ধারণা নিয়ে আসেন তখন সেখানে 'পদ্মারনাচন'সহ অগুনতি ধর্মনিরপেক্ষ কৃত্যের ও ধর্মের যে শুদ্ধতার সুর বা সাধনা রয়েছে, সেই সত্যনিষ্ট পথ সন্ধানের কথাই যেন শুনতে পাই। সত্যানুসন্ধান ও মানবতাবাদে অঙ্গীকারাবদ্ধ গ্রটস্কির "এই অধ্যাত্ম ও ধর্মীয় চেতনা তাকে গভীর রহস্যময় সৃষ্টি বা বিশ্বচরাচরের সঙ্গে মানুষের সর্বাত্মক সংযোগ সাধনের প্রয়াসে নিয়ে যায়। বস্তুতপক্ষে তাঁর নাট্যকর্ম ও বক্তব্যসমূহ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রথাগত অর্থে ধার্মিক না হয়েও ধর্মের অন্তঃস্থিত শুভ ও কল্যাণের বিষয়সমূহকেই তিনি জীবনে ধারণ করা কর্তব্য বলে বিশ্বাস করেছেন" (জিয়া, ২০০৭ : ৭৮)।

দর্শক-অভিনেতা সম্পর্ক

এছাড়াও গ্রটস্কি তাঁর 'পুয়র থিয়েটার' চর্চায় যে সমস্ত বিষয়কে থিয়েটারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন, 'পদ্মারনাচন' পরিবেশনার ক্ষেত্রে তদ্রুপ উপাদানের প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। গ্রটস্কি যেমন অভিনেতা-দর্শক ও স্পেসকে থিয়েটারের জন্য অপরিহার্য উপাদান মনে করেছেন। একইভাবে 'পদ্মারনাচন' পরিবেশনা রীতিতেও উক্ত তিনটি উপাদান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য বাংলা অঞ্চলের প্রায় সমস্ত ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনার ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। পাশাপাশি সামগ্রিকভাবে 'পুয়র থিয়েটার' থেকে 'ওয়ার্কসেন্টার' অর্থাৎ থিয়েটার বিষয়ক গবেষণায় গ্রটস্কির

সর্বশেষ পর্যায় 'Ritual Art' বা 'Art as Vehicle' পর্যন্ত কৃত্য (Ritual)-এর ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। একইভাবে কৃত্যের নানা অনুষঙ্গ যেমন : ঘট, পট, পূজা, নানাবিধ উপাচার ও আনুষ্ঠানিকতা মন্ত্রে সমুজ্জ্বল 'মানত'কেন্দ্রিক লোক পারফরমেন্স এই 'পদ্মারনাচন' যেন গ্রটস্কি প্রবর্তিত বাহুল্যবর্জিত থিয়েটার দর্শনের এক আদর্শরূপ। কেননা, গ্রটস্কি থিয়েটারের 'জীবন্ত অন্তরঙ্গতা'র শক্তিকেই অপরিহার্য হিসেবে বিবেচনা করেছেন। আর দর্শক-শিল্পীর বাঁধাহীন অংশগ্রহণই 'পদ্মারনাচনে'র প্রাণশক্তি। গ্রটস্কির 'পুয়র থিয়েটারে'র কেন্দ্রভূমি হল মানুষ এবং তাঁর মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রকৃত সংযোগ সেতু নির্মাণ। তাঁর থিয়েটারে রাজনীতি কিংবা বিনোদন কোনোটিরই যেন স্থান নেই। তাঁর থিয়েটারের আরাধ্য হলো মানুষের সঙ্গে মানুষের সংযোগ-সূত্র সন্ধানে শেকড়ের আরও গভীরে এক অনিঃশেষ যাত্রা করা। এভাবে দর্শক-অভিনেতার যোগাযোগ প্রশ্নে দুটি পরিবেশনা রীতি যেন একই বিন্দুতে এসে মিলিত হয়।

অনেক অমীমাংসিত শিল্পজিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, সমকালীন প্রথাগত জীবনবিমুখ থিয়েটার-চর্চার বিকল্প ও সুপ্রাচীন এই শিল্পকলার প্রকৃত অর্থময়তার অনুসন্ধানে নিযুক্ত হন গ্রটস্কি। বিশ্লেষণ, বিচার ও গবেষণার মাধ্যমে থিয়েটার শিল্পের প্রকৃত শক্তি প্রসঙ্গে গ্রটস্কি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, দর্শক অভিনেতার অবাধ ও সক্রিয় সংযুক্তিতেই প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে থিয়েটার। তাই তিনি সহজ সংযোগের জন্য দু'দিকের ব্যবধান সম্পূর্ণ ঘুচিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে প্রকৃত যোগাযোগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী মঞ্চের যাবতীয় সীমারেখাগুলিকে ছেঁটে দিয়ে, বাহ্যিক আড়ম্বরের কৌশল ও সমস্ত বাণিজ্যিক প্রলোভনকে প্রত্যাখ্যানের আহ্বান করেন। অর্থাৎ বিভ্রম সৃষ্টিকারী আরোপিত উপাদানগুলোকে সরিয়ে দিয়ে দর্শক-অভিনেতার স্বতঃস্ফূর্ত সংযোগের ফলে থিয়েটার যে নিরাভরণ রূপ গ্রহণ করে, সেটিকেই গ্রটস্কি 'পুয়র থিয়েটারে'র স্বতন্ত্র সৌন্দর্য হিসেবে চিহ্নিত করেন। গ্রটস্কি চিহ্নিত 'পুয়র থিয়েটারের' উক্ত বৈশিষ্ট্য 'পদ্মারনাচন' পরিবেশনা রীতিরও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

নিরাভরণ মঞ্চ, সাজসজ্জা ও পরিবেশনাশৈলী

'পদ্মারনাচনের' আসর পরিকল্পনা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করলে উক্ত প্রসঙ্গ অনুধাবন করতে আরও সহজ হবে বোধ করি। যেমন : 'পদ্মারনাচন' পরিবেশনার জন্য আসরসজ্জা অত্যন্ত সাধারণ ও নমনীয়। মানতকারীর বাড়ির উঠান-আঙ্গিনা, স্কুল প্রাঙ্গণ, বাগানবাড়ীর কোনো খোলা স্থান অথবা সমতল যে কোনো ভূমিতে পরিবেশিত হয়ে থাকে 'পদ্মারনাচন'। সাধারণত মাটির ওপর বৃত্তাকার শূন্যস্থানই মূল পারফরমেন্স আয়তন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কখনও কখনও হয়তো অভিনয় স্থানটিকে ০৪ (চার) টি বাশেঁর খুটির ওপর টিন বা শামিয়ানা দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয়। অনুষ্ঠানস্থলের চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত দর্শকবৃন্দ মাটিতে কিংবা উপস্থিতমতো কোনো কিছু যোগাড় করে আসন গ্রহণ করে। যেখানে সমবেত দর্শকদের সঙ্গে শিল্পীরা একইতলে ও নূন্যতম দূরত্বে অবস্থান করে। অভিনেতা ও দর্শকের এই শারীরিক নৈকট্য উপস্থাপিত আখ্যানের সঙ্গে উভয়কেই একাত্ব হতে দারুণভাবে সাহায্য করে। দর্শক ও পরিবেশনকারীর এই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ সমগ্র অভিনয় কৃত্যকে প্রাণবন্ততায় ভরিয়ে তোলে[১০]। 'পদ্মারনাচনের' এই প্রাকৃতিক এবং অতিসাধারণ আসর পরিকল্পনা গ্রটস্কির বাহুল্যবর্জিত মঞ্চ পরিকল্পনার সঙ্গে যেন অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর এই সহনীয়-বহনীয় মঞ্চ পরিকল্পনার কারণেই গ্রটস্কি তাঁর থিয়েটারকে প্রেক্ষাগৃহ থেকে বের করে প্রকৃতির বিস্তৃত আঙ্গিনায় ছড়িয়ে দিতে পারেন। তিনি তাঁর অভিনেতার অনুশীলন এমনকি

পারফরমেন্সকে নিয়ে চলে যান খোলা আকাশের নীচে, উন্মুক্ত প্রান্তরে, কখনও গম্ভীর পাহাড়ি উপত্যকায় কিংবা জনশূন্য নীরব অরণ্যে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাধারণত ০২ (দুই) দিন ০২ (দুই) রাতব্যাপী অনুষ্ঠিত 'পদ্মারনাচনে'র আসর প্রতিদিন সকাল ০৯.০০ (নয়) টা থেকে শুরু হয়ে দিনের বিভিন্ন ভাগে নির্দিষ্ট সময় বিরতিসহ প্রায় মধ্যরাত পর্যন্ত চলতে থাকে। যে স্থানে পারফরমেন্স অনুষ্ঠিত হয় সেখানকার সুবিধানুযায়ী রাতের অংশের জন্য আলোর ব্যবস্থা করা হয়। হারিকেনের আলো, হ্যাজাক বাতি কিংবা যদি অনুষ্ঠান স্থলে বিদ্যুৎ-এর ব্যবস্থা থাকে তাহলে সাধারণ বিজলি বাতির দ্বারা পুরো প্রাঙ্গণ আলোকিত করা হয়। এই আলো ব্যবহারের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র শিল্পীদের আলোকিত করা নয়, উপস্থিত সুধী এবং শিল্পী উভয়ই যাতে পরস্পরকে দেখতে পায় সেই উদ্দেশ্যেই এই আলোর ব্যবস্থা। গ্রটস্কি তাঁর থিয়েটার ল্যাবরেটরির প্রযোজনার ক্ষেত্রে বলেন : "দর্শককে যখনই কোনো আলোকিত স্থানে রাখা হবে, বা অন্যভাবে বলা যায় তাদের দেখতে পাওয়া যাবে, তখন সে-ও পরিবেশিত শিল্পকর্মের অংশীদার হয়ে ওঠে" (জিয়া, ২০০৭ : ২৬)। 'পদ্মারনাচনে'র পরিবেশনায় দর্শক-কুশীলবের ভেতর আলো-অন্ধকারের বাঁধা না থাকায় পরস্পরকে সরাসরি দেখতে পাওয়া, একই সমতলে এবং অনেক কাছাকাছি দূরত্বে অবস্থানের কারণে দর্শক ও শিল্পীর সকল ব্যবধান যেন ঘুচে যায়। দর্শকের সঙ্গে পরিবেশনাকারীর সহজ ও অন্তরঙ্গ সম্পর্কের এই সহজাত প্রবণতা যেন বাংলা জনপদের ঐতিহ্যবাহী সকল পরিবেশনারই অপরিহার্য উপাদান। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'রঙ্গমঞ্চ প্রবন্ধে' বলেন :

> আমাদের দেশের যাত্রা আমার ঐজন্য ভালো লাগে। যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নাই। পরস্পরের বিশ্বাস ও আনুকূল্যের প্রতি নির্ভর করিয়া কাজটা বেশ সহৃদয়তার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া উঠে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩১৪ : ৭৫)

গ্রটস্কিও এই দর্শক-অভিনেতার সম্পর্ক সূত্র অন্বেষণে ঘুরে বেড়িয়েছেন এশিয়া থেকে আফ্রিকার লোকগাঁথা, লোকনাট্য, লোকাচার কিংবা ধর্মীয় কৃত্যাচারের ভুবনে। দর্শক-অভিনেতার মধ্যে নিবিড় সংযোগ এবং সেই সংযোগ-সূত্রে বোঝাপড়া, আত্মবিশ্লেষণ ও আত্ম-উন্মোচনের প্রয়াসে গ্রটস্কি তাঁর প্রযোজনাতে নানাভাবে পারফরমেন্স স্পেসকে সাজিয়েছেন। উদ্দেশ্য মানুষের সঙ্গে মানুষের সত্যিকারের অকৃত্রিম যোগাযোগ। তাই তিনি বলেন : "Our productions are detailed investigations of the actor-audience relationship (Grotowski, 2002 : 15)। "তবে অভিনেতা ও দর্শককে ক্রমাগত আরও কাছে টানার এই প্রচেষ্টা বিশ্বের নাট্যজগতের নানা মহলের কাছেই খুব সুখের হয়নি" (রথীন, ২০০৯ : ১৫)। "বিভিন্ন রাজনৈতিক শিবিরও তাঁর কাজে সন্তুষ্ট হতে পারেনি, এই যুক্তিতে যে, তিনি অভিনেতাকে সামনে রেখে সমগ্র থিয়েটারকেই অন্তর্মুখীন করে তুলেছেন, শিল্পকে করেছেন আত্মমগ্ন, বিযুক্তি ঘটিয়েছেন মানুষের সঙ্গে। তাঁর সংযোগ-প্রক্রিয়ার তত্ত্ব এক বিশাল ধাঁধাঁ" (রথীন, ২০০৯ : ১৫)।



'পুয়র থিয়েটারে' অভিনয় কৃত্যে নিমগ্ন অভিনেতা

গ্রটস্কির অভিনেতারা প্রচলিত থিয়েটারের রূপসজ্জার ধারণাকেও প্রত্যাখ্যান করে। তারা পরচুলা, দাঁড়ি, গোফ কিংবা বালিশ দিয়ে কৃত্রিম পেট তৈরি করেন না, এসব তাদের কাছে এক ধরনের চতুর কৌশল। তবে 'পদ্মারনাচন' পরিবেশনায় রূপসজ্জার প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। 'পদ্মারনাচন' পরিবেশনায় পারফরমারদের সাজসজ্জা এবং অঙ্গরচনার প্রধান উদ্দেশ্য নারীরূপ ধারণ। উল্লেখ্য যে, উক্ত পারফরমেন্সে পুরুষ অভিনেতারাই নারী চরিত্রগুলোতে অভিনয় করে থাকে। বিভিন্ন চরিত্র ফুটিয়ে তোলার জন্য মূল গায়েন অর্থাৎ প্রধান পারফরমার ছাড়াও ০২(দুই) জন থেকে ০৬(ছয়) জন ছুকরি থাকেন যারা বর্ণনাত্মক এই পরিবেশনা রীতিতে বিভিন্ন নারীচরিত্র এবং নৃত্যশিল্পী হিসেবে পারফর্ম করে থাকেন। উল্লেখ্য যে, মানতকারীর সামর্থ্যানুযায়ী ছুকরির সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়। ন্যূনতম ০২(দুই) দিন ০২(দুই) রাতব্যাপী অনুষ্ঠিত আসরে শিল্পীদের আপ্যায়ন এবং অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যয় নির্বাহের সক্ষমতা বিবেচনায় ০২(দুই) থেকে ০৬(ছয়) জন পর্যন্ত ছুকরি শিল্পীদের পরিবেশনায় যুক্ত করা হয়। সুর-সংগীতে সহযোগিতার জন্য ২-৩ জন বায়েন থাকেন। উল্লেখ্য যে, এই রীতির পরিবেশনায় সব কুশীলবরাই পুরুষ। তাই পুরুষ হয়ে নারীরূপে নিজেকে উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে তারা স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত রূপসজ্জার উপকরণ এবং সাজপোশাক দিয়ে মূল গায়েন এবং ছুকরিবৃন্দ নারীরূপে নিজেদের সাজাতে চেষ্টা করেন। এ প্রসঙ্গে শেরেবুল ইসলাম বলেন : "এ কিচ্ছায় অনেক চরিত্র থাকে, যা নারীরূপে করতে হয়। তাছাড়া একই সঙ্গে দু'দিন গান গাওয়া, নেচে নেচে অভিনয় করা নারীদের পক্ষে কষ্টকর"[১১]। উল্লেখ্য যে, 'পদ্মার নাচনে'র পরিবেশনায় নৃত্যের আধিক্য থাকে বলেই পরিবেশনা আঙ্গিকের সঙ্গে

'নাচন' শব্দটি যুক্ত হয়েছে। তাই বহুকাল আগে থেকেই এ ধরনের পরিবেশনাতে ছেলে পারফরমারদের এই মেয়ে বা ছুকরি সাজার রেওয়াজ শুরু হয়। মেয়েরসাজ বা স্ত্রীলোক রূপে সাজা এভাবে বললে বিষয়টির যথার্থতা অনুধাবন করা বোধকরি কঠিন। লোকনৃত্যে অসম্ভব দক্ষতা সম্পন্ন ছুকরিরূপী শিল্পীবৃন্দ নারীরূপ সৃজনপথে সত্যিকার অর্থেই একজন নারী হয়ে ওঠার চেষ্টা করেন। বাহ্যিক সাজ-পোশাকের বাইরেও তারা যেন নারীত্বকে বরণ করে নেয়। তাদের পারফরমেন্স বিশ্লেষণে আঙ্গিক, বাচিক ও মনস্তাত্ত্বিক অভিনয়শৈলীতে উক্ত প্রসঙ্গের সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়। দীর্ঘ সময় ছুকরিরূপে নিবিষ্টভাবে পারফরমেন্সে যুক্ত থাকার ফলে অধিকাংশ ছুকরি নৃত্যশিল্পীদের ব্যক্তিগত জীবনেও তাদের মধ্যে নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

তবে কুষ্টিয়ার 'শোলক নসিমন' গ্রুপের পরিবেশিত 'পদ্মারনাচন' এর মূল গায়েন মো: শেরেবুল ইসলামের চরিত্রসৃজন ভাবনা ও পরিবেশনাশৈলী স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। চল্লিশোর্ধ একজন মুসলিম যুবক প্রায় ৩০ বছর ধরে 'পদ্মারনাচনে'র মূলগায়েন হিসেবে অন্যান্য চরিত্রসহ কিচ্ছার প্রধান দুই নারী চরিত্র দেবী মনসা ও বেহুলার চরিত্রে নিরবিচ্ছিন্নভাবে অভিনয় করে চলেছেন। উল্লেখ্য যে, ব্যক্তিজীবনে তিনি একজন স্বামী এবং একজন পিতা। যদিও এই ধরনের পারফরমেন্সে বিশেষ করে ছুকরি ও নারীচরিত্রে রূপদানকারী কুশীলবদের লিঙ্গগত আইডেনটিটি প্রসঙ্গে সমাজে সংশয়যুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি প্রচলিত রয়েছে। তবে নারী চরিত্রে অভিনয় ও নৃত্যশৈলী পরিবেশনায় শেরেবুলের পরিবার, তার স্ত্রী ও সন্তানের কাছ থেকে কোন বাঁধা নেই। স্ত্রী তার পারফরমেন্সের আগে পারফরমেন্স সংশিষ্ট উপকরণসমূহ সযত্নে গুছিয়ে শেরেবুলের হাতে তুলে দেয়। শেরেবুলের মতে : তার স্ত্রী তার এই কর্মকাণ্ডে প্রেরণা যোগায়। স্ত্রীর যুক্তি হল : "তার স্বামী খারাপ কোন কাজ করছে না, তাই স্বামীর নৃত্য ও অভিনয়ে তার কোন বাঁধা নেই"। শেরেবুল বলেন : "অনেক নৃত্যশিল্পীও লোক আঙ্গিকের বিভিন্নরীতিতে নারীর ভূমিকায় অভিনয় করা পারফরমাররা যথাযথ ভাবে অভিনয়কে ফুটিয়ে তোলার জন্য নারীসুলভ আচার-আচরণে অভ্যস্ত হয় কিংবা মেয়েদের কথা বলার ধরন, চলা, সাজ ও লাস্যময়তা আয়ত্ব করে, কিন্তু পারফরমেন্সের পরে তারা ঐসব মেয়েলি আচরণ থেকে বের হতে পারে না কিংবা বের হতে চান না"[১২]। কিন্তু পারফরমেন্সের পর শেরেবুল তার অভিনীত চরিত্র থেকে বেরিয়ে আসেন। শেরেবুলের মতে, অনেক নৃত্যশিল্পী এবং পারফরমাররা নিজেকে একটি রূপে দেখেন এবং সে রূপেই নিজেকে প্রকাশ করতে চান। কিন্তু শেরেবুল নিজেকে একরূপে দেখেন না। তিনি নিজেকে শতরূপে চিত্রিত করতে প্রয়াসী। কখনও তিনি নিজ অবস্থান প্রতিষ্ঠায় প্রতিজ্ঞ ভয়ালদর্শন সর্পদেবী মনসা, কখনও পতিব্রতা বেহুলা সুন্দরী আবার কখনও দোর্দণ্ড প্রতাপশালী চাঁদ সওদাগর।

'পদ্মারনাচনে' কৃত্যপালনের উপকরণ স্বরূপ পূজারঘট, কুলায় সাপের প্রতীক এবং থালায় পূজার নৈবেদ্য ব্যতীত অন্য কোনো ধরনের দ্রব্য সম্ভারের ব্যবহার লক্ষ করা যায় না। পারফরমারের নৃত্যশৈলী, শারীরিকভঙ্গি, চলন সর্বোপরি আঙ্গিক ও বাচিক অভিনয়ের উৎকর্ষময় ও অর্থপূর্ণ প্রয়োগ শক্তিতে মানতকারীর উঠানের ছোট্ট আসরটি কখনও তিন নদীর মোহনা, কখনও চাঁদ সওদাগরের সন্তানদের ডিঙ্গা ডুবে যাওয়া উত্তাল সমুদ্র কিংবা স্বর্গে রূপান্তরিত হয়। এভাবে পদ্মার নাচনের অভিনেতারা তাদের অসীম কল্পনা ও শারীরিক ভাষার শৈল্পিক সমন্বয়ের মাধ্যমে একটুখানি সমতল শূন্যভূমিকে মহীয়ান করে তোলে। তবে যে কোনো ঘরানার থিয়েটারের জন্য

এ কথা সত্য যে, অভিনেতারা সেই বিরল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যারা তাদের শিল্পকর্মকে আপনার থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না, কারণ নিজেকে দিয়েই সৃজিত হয় তাঁর শিল্প। এ প্রসঙ্গে অস্কার জি. ব্রোকেট তাঁর *The Theatre an Introduction* গ্রন্থে উল্লেখ করেন :

> The actor's problems are in many ways unique. He is one of the few artists whose principal means of expression cannot be separated from himself, for he must create with his own body and voice, his own psychological and mental endowments .(Oscar, 1964 : 395)

দৈহিক প্রতিবন্ধকতার মূলোৎপাটন ও আঙ্গিকাভিনয়ের সর্বোচ্চ প্রয়োগ

গ্রটস্কির অভিনেতারাও তাদের নিজস্ব অনুশীলনের উপর সম্পূর্ণ আস্থাশীল হয়ে সমস্ত রকম কৌশল ত্যাগ করে কেবল তাদের নিজস্ব শরীর ছাড়া। কারণ, গ্রটস্কির অভিনেতাদের কাছে দেহ হলো অভিনয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আত্মার সকল গোপনসত্তাকে প্রকাশ করার মাধ্যম। প্রচলিত থিয়েটারের অভিনেতা যে পদ্ধতিতে কিংবা যে উদ্দেশ্যে তার দেহকে ব্যবহার করে অভিনেয় চরিত্র নির্মাণ কিংবা সার্বিক থিয়েটার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে, তার সঙ্গে গ্রটস্কির 'পুয়র থিয়েটারে'র আত্ম-উন্মোচনে নিমগ্ন অভিনয় শিল্পীর কর্মপ্রক্রিয়া এবং অভিনয়কৃত্যে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যের বিস্তর পার্থক্য ফুটে ওঠে। একদিকে হলো কোন কিছুর বিনিময়ে দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য শিল্পের খোলসে শরীরের প্রদর্শন আর অন্যদিকে নিরাবরণতার অনুশীলন। গ্রটস্কি চলতি থিয়েটারে ব্যবহৃত অভিনেতা ও তার শারীরিক সক্ষমতার বাইরের কৃত্রিম উপকরণ সমূহকে 'প্লাস্টিক এলিমেন্ট' বলেছেন। কারণ :

> এই উপাদানগুলোর আবার একটা নিজস্ব সত্তা আছে, অভিনেতার অভিনয় ক্রিয়াকে এড়িয়ে গিয়ে তার নিজস্ব কিছু পরিবেশন করতে পারে। তখন আবার অভিনেতার সৃষ্টিকে সে অনেকটাই খাটো করে দেয়। কিন্তু অভিনেতা তার অভিনয়শৈলীর নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের মধ্য দিয়ে একটি ফ্লোর বা অভিনয় স্থানকে রূপান্তরিত করতে পারে সমুদ্রে এমনকি একটা টেবিলকে পরিণত করতে পারে প্রার্থনা বেদিতে। (রথীন, ২০০৯ : ২৭)

গ্রটস্কি তাঁর নিরাবরণ থিয়েটারে সংগীতের ব্যবহারকেও সকল রকম কৃত্রিমতা থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। অভিনেতাদের দেহ, কণ্ঠস্বর এবং প্রযোজনায় ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদানের সংঘাত-সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে যে শব্দ ও সুরের সৃষ্টি হয়ে থাকে সেটাই হয়ে ওঠে থিয়েটার ল্যাবরেটরির নিরাভরণ নাট্যপ্রযোজনার মিউজিক বা আবহ। অবশ্য 'পদ্মারনাচন' পরিবেশনায় দোহার দল একটি ঢোল বা খোল এবং মন্দিরা বাজিয়ে গায়েনকে গানে ও নৃত্যের ছন্দে সহযোগিতা করে। এখানেও কোন ধরনের যান্ত্রিক কলাকৌশল কিংবা রেকর্ডেড মিউজিক ব্যবহার করা হয় না।

আলোচ্যমান প্রবন্ধে ইতোমধ্যেই আলোচনা করা হয়েছে যে, গ্রটস্কি তাঁর থিয়েটার অনুশীলনে অভিনেতা ও তার আঙ্গিকাভিনয়ের সক্ষমতাকেই যেমন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তেমনি 'পদ্মারনাচনে'র পরিবেশনায় ঐতিহ্যগতভাবেই পারফরমার ও তার শরীরই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। গ্রটস্কি শুধু অভিনেতা ও দর্শকের গুরুত্বকে তাত্ত্বিকভাবে ব্যাখ্যা করেই থেমে থাকেননি। অভিনেতার আত্মিক ও শারীরিক শক্তিতে আস্থাশীল গ্রটস্কি তাঁর অভিনেতাদেরকে সেই বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তৈরির কথা বলেন, যেখানে সত্যিকার অর্থেই নাট্যদৃশ্য তৈরি করতে অন্য কোন কিছুর ওপর তার নির্ভর করতে না হয়। এ প্রসঙ্গে 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধে উল্লিখিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাট্যভাবনার অবতারণা করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধে নাট্যসৃজনে বাহ্য প্রাচুর্যের ওপর নির্ভরশীলতাকে শিল্পীর অক্ষমতা হিসেবেই যেন বিবেচনা করেছেন :

> ভারতের নাট্যশাস্ত্রে নাট্যমঞ্চের বর্ণনা আছে। তাহাতে দৃশ্যপটের কোনো উল্লেখ দেখিতে পাই না। তাহাতে যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল, এরূপ আমি বোধ করিনা। কলাবিদ্যা যেখানে একেশ্বরী সেইখানেই তাহার পূর্ণগৌরব। সতীনের সঙ্গে ঘর করিতে গেলে তাহাকে খাটো হইতেই হইবে। বিশেষত সতীন যদি প্রবল হয়। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩১৪ : ৭৩)

একইভাবে গ্রটস্কিও দর্শকের মনে বিভ্রম উৎপাদনকারী যান্ত্রিক সাজসরঞ্জাম বা ধোপদুরস্ত কলাকৌশলকে বাদ দিয়ে সহজিয়া সাধনার এমন এক শিল্পাশ্রম নির্মাণে নিবিষ্ট ছিলেন, যেখানে দর্শক-অভিনেতা কেবল মাত্র পারফরমেন্সের মুখোমুখি হয়ে আত্মবিশ্লেষণ করবে। প্রাত্যহিক প্রকাশের আড়ালে থাকা অপ্রকাশকে দৃশ্যমান ও উদঘাটনে উদ্যোগী হবে। নিজেদের মধ্যে স্থাপন করবে এক অনন্ত-মাত্রিক সম্পর্ক। এক্ষেত্রে তিনি অভিনেতাকে তার নিজের উৎকর্ষময় শারীরিক ক্ষমতার উৎসের সঙ্গে তাকে পরিচয় করিয়ে দেন। আর তখন ঋষিসুলভ ধ্যানশীলতায় অভিনেতারাও নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করে অভিনয় কৃত্যে। ভক্তিভাবে স্নাত 'পদ্মারনাচনে'র কুশীলবেরাও নিজ পারফরমেন্স সামর্থ্যকে সঙ্গী করে লৌকিক দেবী মনসার প্রতি বিশ্বাস ও অন্তরে আল্লাহ-রসুলের নাম নিয়ে আসরে দাঁড়ায়। এভাবে 'পদ্মারনাচনে'র লোকশিল্পীরা আঙ্গিক ও বাচিকাভিনয়ের শৈল্পিক দক্ষতার মাধ্যমে একটি এম্পটি স্পেস (empty space)-কে দর্শকের চিত্তে অসাধারণ নাট্যিক আয়তনে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হন।

মানত, কৃত্য ও আত্মোৎসর্গের পরিবেশনা

'পুয়র থিয়েটারে'র অভিনেতা যেমন আত্মোন্মোচন ও আত্মবিশ্লেণের প্রয়াসে সামগ্রিক নাট্য প্রক্রিয়ায় নিজেকে নিযুক্ত করেন। একইভাবে 'পদ্মারনাচনে'র লোকশিল্পীরা রোগ-শোক ও সমস্যায় পতিত স্থানীয় মানুষদের সুস্থতা ও তাদের মঙ্গলকামনার্থে নিবিষ্ট চিত্তে কৃত্যমূলক এই পরিবেশনায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করে। উল্লেখ্য যে, নদীমাতৃক বাংলা অঞ্চলে তুলনামূলকভাবে সাপের প্রকোপ বেশি থাকায় পল্লি গাঁয়ের হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মের সাধারণ মানুষদের মধ্যে সাপ নিয়ে অনেক মিথ রয়েছে। যে মিথগুলো যুগযুগ ধরে স্থানীয় মানুষের নিজস্ব ঐতিহ্যের পরিকাঠামোর সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। যারা মানত করে এবং গানের শিল্পী উভয়ই মনে করে 'পদ্মারনাচন' গানের মাধ্যমে মানুষের উপকার হয়। গানের দ্বারা সর্পদেবীকে সন্তুষ্ট করতে পারলে সাপের প্রকোপ কমবে ও সাপ মানুষের অনিষ্ট করবেনা। তারা বিশ্বাস করে 'পদ্মারনাচনে'র গান মানত করলে সমস্যা থেকে তাদের পরিত্রাণ ঘটবে এমনকি বিষাক্ত ঘা থেকে সাপের বিষ পর্যন্ত

নেমে যাবে। পারফরমেন্সের এই থেরাপিউটিক ভূমিকাকে যুগযুগ ধরে এই জনপদের মানুষ বিশ্বাস করে আসছে। নিম্নবর্গের মানুষের নিত্যদিনের অসুখ-বিসুখের চিকিৎসায় নানা কৃত্য-আচারসমূহ যেন এক সামাজিক উৎসবে রূপ নেয় এখানে। যেমন : ফাল্গুন মাসে বসন্তরোগ না হওয়ার মানতে বেশ ঘটা করেই আয়োজিত হয় 'শীতলা পূজা'। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে সাপের প্রকোপ থেকে রক্ষা পেতে, সর্পদেবী মনসার স্তুতিমূলক 'রয়ানী গান' পরিবেশনার রেওয়াজ রয়েছে বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ থানাধীন শৌলখালীতে। দক্ষিণ বাংলার গোপালগঞ্জের মাদারীপুরের চান্দারবিল এলাকায় খোস-পাঁচড়া নিরাময়ের মানতে হেচড়াদেবীও পূজিত হন বসন্তকালে। এভাবে বাংলা অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় স্থানীয় রীতি ও বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পর্কিত মানতকেন্দ্রিক কৃত্যমূলক অজস্র পরিবেশনার অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়।



'পদ্মারনাচন' পারফরমেন্সে আত্মনিবেদিত কুশীলব

বর্তমান প্রবন্ধকারের শৈশবের এক ধর্মাচার কৃত্যানুষ্ঠান প্রত্যক্ষণ অভিজ্ঞতার উপস্থাপন উক্ত আলোচনায় প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে পারে। বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের সুন্দরবন সংলগ্ন উপকূলবর্তী বাগেরহাট জেলার শরণখোলা থানার ১নং ধানসাগর ইউনিয়নের শিংবাড়ী নামক স্থানে প্রতিবছর চৈত্র সংক্রান্তিতে অর্থাৎ পহেলা বৈশাখের ঠিক আগের দিন বিকেলে একটি বড় দীঘি এবং তার আশপাশের কিছু স্থানকে ঘিরে 'নীল' নামের চৈত্র সংক্রান্তির অনুষ্ঠান হত। অনুষ্ঠান স্থলে স্থানীয় অধিবাসীরা নানা জিনিসের পসরা সাজিয়ে বসত। নকশা করা বিভিন্ন ধরনের মাটির বাসন-কোসন, মাটির পুতুল, কামারদের তৈরি নানা ধরনের লোহার দা, কাচি (ধান কাটার জন্য ব্যবহার করা হয়) এবং ছোটদের প্রধান আকর্ষণ ছিল লোহার তৈরি ছোট দা (লোহার ছুরি) কেনা। এই দা দিয়ে গাছে উঠে কাঁচা-মিঠা আম কেটে খাওয়াই ছিল মূল উদ্দেশ্য। এছাড়া চুড়ি-ফিতা, বিভিন্ন মৌসুমী ফল উঠত অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে, এসব নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদির ক্রয়-বিক্রয়

ও বিভিন্ন আনন্দ আয়োজনের পাশাপাশি ধর্মীয় কৃত্যাচার অনুষ্ঠানটি দীঘির পানিতে অনুষ্ঠিত হত। হিন্দু ধর্মাবলম্বী নারী-পুরুষরাই এই কৃত্যব্রত পালন করত। 'নীলের' মধ্যেও 'পদ্মারনাচনের' মত মানতের বিষয় জড়িত। সাধারণত পূজারি তার কোন মনোবাসনা কিংবা রোগ থেকে মুক্তির জন্য এই ব্রত পালন করত। পূজারি আর পুরোহিত দুজন দীঘির প্রায় গলা সমান পানিতে নামেন। এরপর পুরোহিত অগ্রভাগ সুতীক্ষ্ণ ও সুচালু একটি লোহার শিকের সাহায্যে আড়াআড়িভাবে পূজারির জিহ্বাকে ভেদ করেন। লোহার শিক গাঁথা জিহ্বাসহ পূজারি পানিতে ডুব দেন।

এভাবে পূজারি জিহ্বায় শিক গাঁথা অবস্থায় তিনবার পানিতে ডুব দেন। কৃত্য চলাকালীন পুরোহিতের মন্ত্রোচারণ, উলুধ্বনি এবং দীঘির চারপাশে সমবেত মানুষের কৃত্যের প্রতি আগ্রহ মিলে এক অসাধারণ পরিবেশ সৃষ্টি হত। এ যেন যন্ত্রণা ক্লিষ্টতার মাধ্যমে প্রায়শ্চিত করা। আত্মত্যাগের মাধ্যমে বিশ্বাসের অনন্ত সরোবরে অবগাহন। উল্লেখ্য যে, চৈত্র সংক্রান্তিতে 'নীল' নামের এই অনুষ্ঠানে কৃত্য পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ পূজারি 'নীলের' ০৩ (তিন) দিন আগে এবং কৃত্যপালনের পর ০৫ (পাঁচ) দিন পর্যন্ত উপবাস করেন। গ্রটস্কি তাঁর অভিনেতাদের হলি অ্যাক্টর (holy actor) হবার জন্য 'Psychic Penetration'[১৩]-এর যে কথা বলেন এই কৃত্যও যেন সেই যন্ত্রণা সহ্য ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে পুণ্য লাভের প্রয়াস। উক্ত কৃত্যানুষ্ঠান হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষরা পালন করলেও চৈত্র সংক্রান্তির এই 'নীলের' মেলায় হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে স্থানীয় জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, 'সাধনা' ঢাকা, 'পদ্মারনাচনে'র ওপর ভিত্তি করে 'পদ্মা-বেহুলা আখ্যান' নামে একটি নৃত্যনাট্য প্রযোজনা করে। উক্ত নৃত্যনাট্যে মোহাম্মদ শেরেবুল ইসলামসহ 'শোলক-নসিমন' শিল্পগোষ্ঠীর সদস্যবৃন্দ ও 'সাধনা'র নৃত্য-নাট্যশিল্পীবৃন্দের সঙ্গে বর্তমান প্রবন্ধকারও পারফর্ম করেন। এছাড়া একই সঙ্গে বাংলাদেশ ও ভারতে কয়েকটি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ এবং শেরেবুল ইসলামের পারফরমেন্স ভাবনা বিষয়ক অনুষ্ঠানের মডারেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। উক্ত সৃষ্টিশীল কর্মপ্রয়াস পরস্পরের ব্যক্তিজীবন ও শিল্পচেতনাকে গভীরভাবে বুঝতে সাহায্য করে। এ পর্যায়ে উক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে পূর্বে উল্লিখিত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ, লোকশিল্পী শেরেবুলের প্রাত্যহিক সাধারণ অবস্থা থেকে পারফরমেন্সের সময় অসাধারণ উৎকর্ষময় অবস্থায় আরোহণ প্রক্রিয়া তুলে ধরা হবে। পাশাপাশি সংস্কৃতিবান একজন মানুষের জীবন সংগ্রামের বিভিন্ন দিক উন্মোচনের চেষ্টা করা হবে। জনমানুষের শিল্পী শেরেবুল জীবিকা নির্বাহের জন্য কৃষিকাজ, কাঁচামালের ব্যবসা কিংবা ভ্যান/রিকসা চালক হিসেবে কাজ করেন। এগুলোই তার প্রধান পেশা যার মাধ্যমে সে জীবিকা সংগ্রহ করে থাকেন। এরকম শ্রমসাধ্য পেশার সঙ্গে যুক্ত থেকে এবং নিয়মিত কাজ করে 'পদ্মারনাচনে'র মতো শারীরিক অভিনয়ভিত্তিক একটি পাফরমিং আর্টে কীভাবে এত নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন? এমন প্রশ্নের জবাবে শেরেবুলের নিজ জীবন অভিজ্ঞতার ভেতর থেকে উৎসারিত উত্তর হলো : "অভিনয় করতে, নাচ করতে ভালোলাগে, এই গানে মানুষের উপকার হয়। আর মানুষ যখন উপকৃত হয় তখন তারা আমাদের খাতির করে, সম্মান করে। আর গান করবার শক্তি এমনিতেই এসে যায়। বিশেষ করে বন্দনা শুরুর আগে দেবী মনসার জন্য পূজারঘট স্থাপন ও নৈবেদ্য দেওয়ার সময় থেকেই মনের মধ্যে একটি বিশেষ অবস্থায় প্রবেশের মুহূর্ত তৈরি হয়। শরীর রোমাঞ্চিত হয়, তাড়না কাজ করে গান করবার (শেরেবুল ইসলামসহ দলের প্রায় সব শিল্পীই সাধারণ কথাবার্তায় 'পদ্মারনাচন'কে গান

হিসেবেই উল্লেখ করে থাকেন)। আর পালা একবার শুরু হয়ে গেলে সবকিছু আপনা-আপনি ঘটতে থাকে"[১৪]। শেরেবুল আরও বলেন : "দীর্ঘদিন ধরে এই পদ্মার গান করার ফলে হয়তো এখন সবকিছু অনেক সহজে হয়। আর মা মনসার আশীর্বাদ তো আছেই। আসলে পালার মধ্যে একবার ঢুকে গেলে আর শরীরের ঘাম ঝরতে শুরু করলে নাচে, অভিনয়ে আর কোনো কষ্ট অনুভব হয় না বরং এক দারুণ ভাললাগা কাজ করে। তাছাড়া মানতকারী, ভক্ত-পূজারি ও উপস্থিত দর্শকশ্রোতাদের সাড়াও সুন্দরভাবে গান করতে অনেক সাহায্য করে"[১৫]। বছরের পর বছর ধরে ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির এই সমৃদ্ধ সম্পদ 'পদ্মারনাচন' পরিবেশন করলেও তাদের তেমন কোনো পৃষ্ঠপোষকতা অথবা অর্থলাভের সুযোগ নেই বললেই চলে। তাহলে কেন দিনের পর দিন কষ্ট করে এত শ্রমসাধ্য পারফরমেন্স করা যেখান থেকে ন্যূনতম আর্থিক উপার্জন হয় না? এমন প্রশ্নের জবাবে শেরেবুলের উত্তর : "এই গান এখন নেশা হয়ে গেছে, গান করার সময়ই মনে হয় অনেক ভালো থাকি। এছাড়া আগে যারা এটা করে গেছেন তাদের প্রতি সম্মান জানানো এবং এই ধারাটি যাতে টিকে থাকে সেজন্যই এই গান করে চলেছি"[১৬]।

পূর্বসূরীদের সম্মান জানালেও 'পদ্মারনাচন' পারফরমেন্স শেখার ক্ষেত্রে সে অর্থে তাঁর কোন গুরু নেই। যদিও কুষ্টিয়া অঞ্চলে যুগযুগ ধরে এই রীতি পরিবেশিত হয়ে আসছে। কুষ্টিয়া অঞ্চলের সমৃদ্ধ লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্য ও চর্চা কিশোর শেরেবুলকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করে। ঐ আগ্রহ থেকে একদিন 'পদ্মারনাচনে'র স্থানীয় শিল্পী আকবর আলীর অনুষ্ঠানে গান পরিবেশনের চেষ্টা এবং পারফর্ম করতে না পারার ব্যর্থতাই শেরেবুলকে সংস্কৃতির এই অঞ্চলে প্রবেশ করতে সাহায্য করে। 'পদ্মারনাচন' পারফরমেন্স বিষয়ক প্রায় সকল শিক্ষাই শিল্পী শেরেবুলের একান্ত নিজস্ব সৃজন। শেরেবুল বলেন : "রাতের পর রাত মাটিতে ইটের টুকরা দিয়ে দাগ কেটে ছক বানিয়ে বানিয়ে 'পদ্মারনাচনে'র বিভিন্ন মুভমেন্ট, অঙ্গভঙ্গি ও নৃত্য শিক্ষায় নিজে আত্মানিয়োগ করেছেন"[১৭]। তার মানে এই ঘরানার পরিবেশনা দেখার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তিনি নিজে নিজে শিখেছেন। তাই তার শিল্পযাত্রায় তিনি স্বতন্ত্র। তার নির্মোহ ও অতিসাধারণ জীবনদর্শন নিঃসন্দেহে তার শিল্পসত্তাকে প্রভাবিত করে থাকে। শেরেবুল ইসলামের ব্যক্তিসত্তা ও শিল্পসত্তার গভীরে প্রবেশ করলে সুশৃঙ্খল নির্লোভ ও নিবেদিত একজন সহজ মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়। সামাজিক অবস্থান, কিংবা বাহ্যিক শারীরিক সৌন্দর্যে পিছিয়ে পড়া শেরেবুলের সৃজনশীল চেতনার সংস্পর্শে আসলে, সত্যিকার অর্থেই তার মধ্যে এক উদার ও উদ্ভাসিত ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ব্যক্তিত্বের এই বড়ত্বই হয়তো শিল্পী শেরেবুলের অতিসাধারণ ছোট মঞ্চকে মহিমান্বিত করে তোলে। জীবিকার তাগিদে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পেশার সাথে যুক্ত থাকলেও 'পদ্মারনাচনের' অভিনয়ে তার শিল্পীমনের বিশালত্ব বেরিয়ে আসে। জীবনের চেয়ে বড় পুরাণাশ্রিত মহান ঔদার্যের বোধ সম্পন্ন ব্যক্তিমানুষ কিংবা দেব-দেবীর চরিত্রসমূহকে অত্যন্ত সাবলীল, স্বতঃস্ফূর্ত এবং বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থাপনে সক্ষম হন তিনি।

স্বশিক্ষিত ও নিজস্ব সৃজন ভাবনার ভেতর দিয়ে তৈরি 'পদ্মারনাচনে'র শিল্পী শেরেবুল ও তার দলের সদস্যরা হয়তো গ্রটস্কির থিয়েটার ল্যাবরেটরির অভিনেতাদের মত সুশৃঙ্খল প্রশিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে বেড়ে ওঠেননি। কিন্তু নিজেদের মত করে তাদের শিল্প-সাধনার সহজ আত্মিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি রয়েছে। তাদের সার্বিক জীবনধারণ প্রণালি লক্ষ করলে যার প্রমাণ যায়। বাংলাদেশের

গ্রামীণ জনপদে ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক ধারাকে লালন করা এখনো এমন অনেক শিল্পপাগল মানুষ রয়েছে যারা ঐতিহ্যগত পরম্পরায় প্রাপ্ত এইসব ভূমিজ সংস্কৃতির মায়ারটানে পুরো জীবনটাই উৎসর্গ করেছেন। মনেরটান ও সৃষ্টিতে মোহাবিষ্ট সেই শিল্পযাত্রীদের একজন মোহাম্মদ শেরেবুল ইসলাম। তিনি যে কেবলমাত্র পারফরমেন্সের সময়ই নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করেন তা নয়, মানুষের মঙ্গলকামনার্থে অনুষ্ঠিত 'পদ্মারগানে' যেন নিজের সমগ্র জীবনটাকেই উৎসর্গ করেছেন।

আখ্যানভাগ এবং নাট্যবিষয়

অভিনয় অনুশীলন প্রক্রিয়া ও মঞ্চ সজ্জায় 'পুয়র থিয়েটার' দর্শন প্রয়োগের পাশাপাশি অভিনেতাদের আত্ম-উৎসর্গে উদ্বুদ্ধকরণে গ্রটস্কি নির্বাচিত নাটক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সে ধরনের নাটকই তিনি প্রযোজনার জন্য নির্বাচন করেন যার বিষয়বস্তুতে পবিত্রতা, ধর্মীয়বোধ কিংবা ধর্মাচারকৃত্য বা থিয়েটারের আদিরূপ বিদ্যমান। গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত যে, আদিম ধর্মাচার কৃত্যানুষ্ঠানের মাধ্যমেই থিয়েটারের সূত্রপাত। তবে গ্রটস্কি মনে করেন :

> ধর্মের নিশ্চিত এবং সম্ভবত অবশ্যম্ভাবী পতনে সমকালীন থিয়েটার চর্চায় ধর্মকৃত্য নির্ভর ভূমিকা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আর সে কারণেই থিয়েটারের পবিত্রতা সম্পর্কে বহুযুগের যে পুরোনো বোধ, তাকে সৃষ্টি করার সম্ভাবনার উদ্দেশ্য তিনি ব্যক্ত করেছিলেন। (জিয়া, ২০০৭ : ৭৭)

তাই তাঁর নাট্যসৃষ্টিতে ধর্মনিরপেক্ষ রিচুয়াল এবং বিষয়বস্তুতে যিশুর যন্ত্রণা, যিশুর আর্বিভাব কিংবা পুনরুত্থান প্রসঙ্গগুলো বারেবারেই উঠে আসে। গ্রটস্কির প্রযোজনার এই সকল ধর্মীয় উপাদান প্রয়োগের কারণ অনুসন্ধানে ধর্মের আত্মত্যাগ বা আত্মোৎসর্গের মহান পথকে আত্মীকরণের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে 'পদ্মারনাচনে'র আখ্যানভাগ গড়ে ওঠেছে বাংলা জনপদের গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের আদ্যোপান্ত রুচি ও বিশ্বাসের ভেতর থেকে। যার গভীরে প্রোথিত লৌকিক সংস্কার, কৃত্যাচার এবং অতিলৌকিক কল্পনার ঐশ্বর্য। গ্রটস্কি যেমন তাঁর স্বকীয় নাট্যভাষা নির্মাণে যাপিতজীবনের চেয়ে মহান ঘটনাবলিকে আশ্রয় করেছেন, তেমনিভাবে কৃত্য ও শিল্পরস সমৃদ্ধ 'পদ্মারনাচনে'র আখ্যান ভাগে মনসার পূজা প্রাপ্তি, বেহুলার স্বর্গযাত্রা, অমর্ত্যলোকের দেব-দেবীর পরিচয়, বেহুলা লখিন্দরের স্বর্গ থেকে ফিরে পুনরায় স্বর্গে প্রত্যাবর্তন প্রভৃতি অতিলৌকিক ঘটনা পরম্পরার সন্নিবেশ লক্ষ করা যায়। যদিও আপাতভাবে আখ্যানের বিভিন্ন এপিসোডের শিরোনাম 'পদ্মারনাচন'কে হিন্দু ধর্মের আচারসর্বস্ব পরিবেশনা হিসেবে চিহ্নিত করে। কিন্তু পরিবেশনার শুরুতে আল্লাহ-রসুলের বন্দনার সঙ্গে লক্ষ্মী-সরস্বতীর বন্দনা 'পদ্মারনাচনে'র ধর্মনিরপেক্ষ বৈশিষ্টকেই যেন তুলে ধরে। তবে অভিনেতারা ধর্মের শুদ্ধতা ও কৃত্যের পবিত্রতাকে আশ্রয় করেই জীবনের চেয়ে সুমহান পুরাণের চরিত্রসমূহকে জীবন্ত করে তোলে। তাঁরা প্রার্থনার একাগ্রতায় সমগ্র নাট্যক্রিয়ায় নিজেকে নিযুক্ত করে। একইভাবে গ্রটস্কির অভিনেতারাও আত্মোন্মোচন কিংবা বলা যায় আত্মশুদ্ধির পথে পারফরমেন্স প্রক্রিয়ায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করে। এভাবে আত্মনিবেদন মন্ত্রে দীক্ষিত 'পুয়র থিয়েটার' ও 'পদ্মারনাচন'-এর অভিনয় শিল্পীরা নিজেদের গভীর অন্তরঙ্গতার মধ্য দিয়ে বিশ্বাসের সাথে তাদের সৃজিত শিল্পের মাধ্যমে আত্মোৎসর্গে সক্রিয় হন। নিঃসন্দেহে যা একজন প্রকৃত শিল্পীর কাছে অসাধারণ অনির্বচনীয় এক পরমানন্দের মুহূর্ত।

শেষকথা

'পুয়র থিয়েটার' থেকে 'প্যারা থিয়েটার' (Paratheatre), 'থিয়েটার অব সোর্সেস' (Theatre of Sources), 'অবজেকটিভ ড্রামা' (Objective Drama) কিংবা "Work Centre of Jerzy Grotowsky'-এ গৃহীত প্রকল্প 'Ritual Art বা Art as Vehicle" (জিয়া, ২০০৭ : ৯১) সামগ্রিক প্রচেষ্টায় গ্রটস্কি অভিনেতা-দর্শকের মধ্যে নিবিড় একাত্মতাবোধ সৃষ্টির চেষ্টা করে গেছেন। কারণ গ্রটস্কির কাছে থিয়েটার ছিল অন্য মানুষের সঙ্গে সংযোগ-স্থাপনের যথার্থ মাধ্যম। তাই নিজেকে প্রকাশের জন্য তিনি থিয়েটারকেই বেছে নিয়েছিলেন। বিশেষ করে বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতির পুরোনো ও আবহমান রিচুয়াল (Ritual)-কে নাট্যসৃষ্টির জন্য উদ্দেশ্যায়িত করা ছিল তাঁর অন্যতম লক্ষ্য। কারণ, তিনি বিশ্বাস করতেন যে, "প্রতিটি রিচুয়ালই তার অভ্যন্তরে নিজস্ব সারমর্ম ধারণ করে" (জিয়া, ২০০৯ : ৮৮)। তাই জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সংস্কৃতি ও ভাষাগত বিস্তর পার্থক্য সত্ত্বেও গ্রটস্কি সকল মানুষের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপন করার প্রয়াসে যে সূত্রের সন্ধানে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন, আলাদা ভৌগোলিক অবস্থান ও ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর দুটি শিল্পাঙ্গিক 'পদ্মারনাচন' ও 'পুয়র থিয়েটারে'র সৃজনশৈলী যেন সেই সূত্রেই গাঁথা। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পশ্চিমা বিশ্বের প্রথাবিরোধী সৃজনশীল একজন মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত 'পুয়র থিয়েটার' এবং আবহমান বাংলার লৌকিক ধর্মাচারকৃত্যের গাম্ভীর্য সম্পন্ন 'পদ্মারনাচনের' এই যে প্রত্যক্ষ সূত্রহীন সাদৃশ্য, আসলেই তা জাতি, ধর্ম, দেশ, কালের সীমানা বা বৃত্তের বাইরে সারা বিশ্বের অতিসাধারণভাবে বেঁচে থাকা সহজ ও শুদ্ধ শিল্পরূপ সন্ধানী সমচেতনা সম্পন্ন মানুষের শিল্পচেতনার এক অদৃশ্য সংযোগ সূত্রের পটভূমিতেই বিবেচ্য।

টীকা

১. "Spiritual awakenings"- A realization or inspiration about the connection with an entity or entities beyond the immediate and physical world of God or other intangible, sacred spirit. (yourdictionary.com). Accessed August 10, 2020
"Spiritual awakenings"- Spiritual awakening refers to a shift in consciousness, an apperception of reality which had been previously unrealized. The culmination of such realizations is in the recognition of oneness with all of existence. (urbandictionary.com).Accessed August 11, 2020

২. https://culture.pl/en/artist/jerzy-grotowski, Accessed November 18, 2021. (ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ প্রবন্ধকারের নিজস্ব।)

৩. https://culture.pl/en/artist/jerzy-grotowski, Accessed November 18, 2021. (ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ প্রবন্ধকারের নিজস্ব।)

৪. https://culture.pl/en/artist/jerzy-grotowski, Accessed November 19, 2021. (ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ প্রবন্ধকারের নিজস্ব।)

৫. জর্জি গ্রটস্কি তাঁর সময়ে প্রচলিত বাণিজ্যিক থিয়েটার অর্থাৎ সেট, আলো, দ্রব্যসম্ভার ও বাহারি পোশাক-পরিচ্ছদ ও মায়াবিভ্রমের দ্বারা সৃষ্ট চিত্তাকর্ষক নাট্য প্রযোজনাকে দোষ-ত্রুটিতে ধনী 'Rich Theatre' বা 'Synthetic Theatre' রূপে আখ্যায়িত করেছেন।

৬. 'Poor theatre' – অজস্র ভ্রান্তি ও ত্রুটিতে সমৃদ্ধ সমকালীন রিচ থিয়েটার (Rich Theatre)

শিল্পকলার বিভিন্ন ধারা থেকে রসদ সংগ্রহ করে একধরনের হাইব্রিড আর্ট নির্মাণের চেষ্টা করে। থিয়েটার সমন্বিত শিল্পকলা প্রচলিত এই ধারণার বিপরীতে থিয়েটারকে একক ও সার্বভৌম শিল্পকলা হিসেবে চিহ্নিত করতে অনুসন্ধানে নিমগ্ন হন জর্জি গ্রটস্কি। পরিশেষে সমকালীন রিচ থিয়েটারের (Rich Theatre) বিপরীতে 'টুওয়ার্ডস আ পুয়র থিয়েটার' (Towards A Poor Theatre) ভাবনার মাধ্যমে বাহুল্যবর্জিত ও নিরাভরণ যে থিয়েটার দর্শনের প্রস্তাব করেন তাই গ্রটস্কি প্রবর্তিত 'পুয়র থিয়েটার' (Poor Theatre)। যে থিয়েটারে অভিনেতা ও দর্শকই একমাত্র অপরিহার্য উপাদান। বিশেষ করে অভিনেতা-দর্শকের প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত সংযোগই এই থিয়েটার প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অন্য কিছু নয়।

৭. 'সাধনা' (উপমহাদেশীয় সংস্কৃতি প্রসার কেন্দ্র) ঢাকা প্রযোজিত 'পদ্মারনাচনে'র ওপর ভিত্তি করে নৃত্যনাট্য নির্মাণকালীন 'শোলক-নসিমন' দলের সাংগঠনিক প্রধান এবং দলের বায়েন মো: শোলকের সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় অক্টোবর ২০১৭, 'সাধনা' মহড়া কক্ষ, বনানী, ঢাকা এবং টেলিফোনে সাক্ষাৎকার গ্রহণ নভেম্বর ২০২১।

৮. ঢাকা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং ভারতে মোহাম্মদ শেরেবুল ইসলাম ও তার দলের সঙ্গে প্রশিক্ষণ, মহড়া, একই সঙ্গে প্রদর্শনীর অভিজ্ঞতা এবং 'পদ্মারনাচন' পরিবেশনা প্রত্যক্ষণের আলোকে শেরেবুল ইসলামের পারফরমেন্স দক্ষতা উন্মোচন। জুলাই ২০১৭ - জানুয়ারি ২০১৯।

৯. 'সাধনা' (উপমহাদেশীয় সংস্কৃতি প্রসার কেন্দ্র) ঢাকার নৃত্য ও নাট্যশিল্পীদের 'পদ্মারনাচন' বিষয়ক ফিল্ডওয়ার্ক (কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা, মিরপুর ও দৌলতপুর থানার বিভিন্ন গ্রাম) এবং প্রশিক্ষণ দানের সময় সরাসরি মোহাম্মদ শেরেবুল ইসলামের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়, জুলাই-অগাস্ট ২০১৭, কুষ্টিয়া এবং শিল্পকলা, ঢাকা।

১০ ·২০১৩-২০১৪ সালে বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ উপজেলার শৌলখালীতে'পদ্মাপুরাণ' অবলম্বনে 'রয়ানী গান' এবং ২০১৭-২০১৯ সময়কালে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে মোহাম্মদ শেরেবুল ইসলামের 'পদ্মার নাচন' পরিবেশনা প্রত্যক্ষণ ও ফিল্ডওয়ার্ক।

১১. 'সাধনা' (উপমহাদেশীয় সংস্কৃতি প্রসার কেন্দ্র) ঢাকা প্রযোজিত 'পদ্মার নাচনে'র ওপর ভিত্তি করে নৃত্যনাট্য নির্মাণের সময় মোহাম্মদ শেরেবুল ইসলামের সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়, আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১৭, 'সাধনা' মহড়া কক্ষ বনানী, ঢাকা।

১২. প্রাগুক্ত।

১৩. 'Psychic Penetration'- গ্রটস্কির মতে অভিনেতা তার চরিত্র সৃজন পথে অজস্র বাধাঁর মুখোমুখি হয়। অভিনেতার বাহ্যিক ও অর্ন্তনিহিত এই শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রতিবন্ধকতাসমূহের জরুরি অপসারণ প্রয়োজন। কেননা ঐ বাধার কারণেই অভিনেতা তার অভিনীত চরিত্রকে সাবলীলভাবে প্রকাশ করতে পারে না। বিশেষভাবে এই জড়তাই দর্শক ও অভিনেতার সাক্ষাৎ-সংযোগের প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তবে অভিনেতা তার অভিনেয় চরিত্রকে নিজ সত্তায় প্রবেশ করাতে সক্ষম হলেই নিজেকে পরিব্যাপ্ত করতে পারে, যাকে (সত্তায় প্রবেশ করানো প্রক্রিয়াকে) জর্জি গ্রটস্কি 'Psychic Penetration'- বলে অভিহিত করেছেন।

১৪. মোহাম্মদ শেরেবুল ও শোলক-নসিমন দলের সদস্যবৃন্দ এবং 'সাধনা' (উপমহাদেশীয় সংস্কৃতি প্রসার কেন্দ্র) ঢাকা প্রযোজিত 'পদ্মা-বেহুলা আখ্যান' পারফরমেন্স নিয়ে 'ষড়ঙ্গ-ষড়ভুজ নৃত্যনাট্য' উৎসবে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে ভারত ভ্রমণকালে সরাসরি গৃহীত মোহাম্মদ শেরেবুল ইসলাম-এর সাক্ষাৎকার। জানুয়ারি ২০১৮, কলকাতা, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

১৫. প্রাগুক্ত।

১৬. প্রাগুক্ত।

১৭. The Ocean Dance Festival of Bangladesh 2019
The World Dance Alliance-Asia Pacific event hosted by Nrityajog (WDA-BD) in Cox's Bazar, Bangladesh from November 22-25, 2019. অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ শেরেবুল ইসলামের পরিবেশনার একজন মডারেটর হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে সরাসরি এই সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

সহায়কপঞ্জি

ইস্রাফিল শাহীন (২০০৪)। 'নাট্যকলাবিদ জর্জি গ্রটস্কি : উল্টোস্রোতের সাঁতারু', *থিয়েটারওয়ালা*। ষষ্ঠ বর্ষ (৬ বছর পূর্তি সংখ্যা) চতুর্থ সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৪।

জিয়া হায়দার (২০০৭)। *থিয়েটারের কথা (৫ম খণ্ড)*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

রথীন চক্রবর্তী (২০০৯)। *ইয়ের্জি গ্রোতোভস্কি*। নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩১৪)। *বিচিত্র প্রবন্ধ, 'রঙ্গমঞ্চ'*। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।

সেলিম আল দীন (১৯৯৬)। *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য*। হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা।

সৈয়দ জামিল আহমেদ (১৯৯৫)। *হাজার বছর : বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা*। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা।

Jerzy Grotowski (2002). *Towards a Poor Theatre.* edited by Eugenio Barba, Routledge, New York.

Oscar G. Brockett (1964). *The Theatre an Introduction*. Holt, Rinehart and Winston, New York.